ঈমানের দাবী

আব্বাস আলী খান

আব্বাস আলী খান

বিশ্ব তথ্য কেন্দ্র

نشان مرد مؤمن بتو گویم
چون مرگ آید تبسم برلب اوست

বলে দিব কি মর্দে মু'মিনের চিহ্ন কি?
মরণ আসে যবে দুয়ারে তার,
মুচকি হাসি দেখা যায় ওষ্ঠে তার,
আর এটাই হলো পরিচয় ঈমানের।

কৈফিয়ত

আলহামদুলিল্লাহ! সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্য যিনি সুলেখক আব্বাস আলী খান রচিত 'ঈমানের দাবী' গ্রন্থটি প্রকাশ করার তাওফিক দিয়েছেন। আব্বাস আলী খান ছিলেন একাধারে ইসলামী চিন্তাবিদ, শিক্ষাবিদ, রাজনীতিবিদ এবং সুলেখক ও অনুবাদক। তাঁর লেখালেখি, পাণ্ডিত্য, ভাষা জ্ঞান সম্পর্কে ভালোভাবে পরিচিত হই ১৯৯৪ সালে। তখন প্রতি মাসে একবার সাংগঠনিক কাজে তার বাসায় যাওয়ার সুযোগ হতো। পরবর্তীতে ১৯৯৭ সালে ছাত্রসংবাদের লেখা আনার জন্য বহুবার তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করার সুযোগ হয়েছিল। তখন তিনি 'মুসলমানদের অতীত ও বর্তমান' শিরোনামে ছাত্রসংবাদে ধারাবাহিক লিখতেন।

কথা প্রসঙ্গে সাহস করে একদিন বললাম স্যার একটি প্রকাশনা সংস্থা করেছি আপনার লেখা একটি বই দিন। তিনি বললেন পরে দেখা করিও। কথা মতো কিছুদিন পর আবার দেখা করলাম। তখন তিনি 'ঈমানের দাবী' বইটি দিবেন বলে জানালেন। সে সাথে বললেন এ বইটি এক সময় প্রকাশিত হয়েছিল-এর সংস্করণ করে তোমাকে দিব। সে মতে তিনি সংস্কারে হাতও দিয়েছিলেন কিন্তু শত ব্যবস্ততার কারণে সংস্করণ সম্পন্ন করতে পারেননি। ফলে সামান্য কিছু সংস্করণ সম্পন্ন করেই বইটি আমাকে দিয়ে দিলেন। বললেন, আল্লাহ তাওফিক দিলে পরে বইটির কলেবর বৃদ্ধি করা যাবে।

এবার বই প্রকাশের পালা। কম্পোজ, প্রুফ ও প্রচ্ছদসহ আনুসঙ্গিক কাজ দ্রুত সম্পন্ন করে ফেললাম। কিন্তু হঠাৎ আমি দুর্ঘটনায় মারাত্মকভাবে আহত হওয়ায় বইটি আর প্রকাশ করা হলো না। ইতিমধ্যে আমি অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠেছি এমনি মুহূর্তে ১৯৯৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে খান সাহেব আমাকে ডেকে পাঠালেন। আমি উপস্থিত হয়ে বিলম্বের কারণ জানালাম এবং পাণ্ডুলিপি ফেরত দিতে চাইলাম। তখন তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি কিছুদিন সময় দিলে বইটি প্রকাশ করতে পারবে? না পারলে এটি আধুনিক প্রকাশনী বা মওদূদী রিসার্চ একাডেমী দিয়ে দিবো। বললাম, হ্যাঁ কয়েক মাস সময় দিলে প্রকাশ করতে পারবো ইনশাআল্লাহ। তখন তিনি বললেন তোমাকে যখন বইটি দিয়েছি ফেরত নিবো না। তুমি যতটা তাড়াতাড়ি সম্ভব প্রকাশ করো। কারণ আমার শরীর স্বাস্থ্য ভালো যাচ্ছে না বই প্রকাশ হয়েছে দেখে যেতে চাই। কিন্তু না আমার দুর্ভাগ্য বইটি যথাসময়ে এবারও প্রকাশ করতে পারলাম না। অবশেষে ১৯৯৯ সালের ৩ অক্টোবর আব্বাস আলী খান এই ক্ষণস্থায়ী পৃথিবী ত্যাগ করে মহান আল্লাহর ডাকে পাড়ি জমালেন মহাজীবনের পথে। যা হোক ব্যক্তিগত নানা সমস্যা ও প্রতিকূলতা পেরিয়ে অবশেষে বইটি প্রকাশ করতে পেয়ে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি। সেই সাথে অনিচ্ছাকৃত বিলম্বের জন্য দুঃখিত।

ঈমানের দাবী এ বইটিতে লেখক কুরআন ও হাদীসের আলোকে সুনিপণভাবে ঈমানিয়াতের বিশ্লেষণ, ঈমানদারের পরিচয়, ঈমানের দাবী, মুমিনের গুণাবলি, ঈমান ও কুফরের পার্থক্য, ঈমানের অগ্নিপরীক্ষা, মুমিনদের জন্য সুসংবাদসহ ঈমানের প্রভৃতি বিষয় অত্যন্ত সাবলীলভাবে আলোচনা করেছেন। নিঃসন্দেহে এটি ঈমান বিষয়ক একটি মৌলিক গ্রন্থ। আশা করি বইটি পাঠে একজন মানুষ সত্যিকার ঈমানদার হওয়ার নির্দেশনা পাবেন এবং ঈমানের দাবী সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা পাবেন। আল্লাহ আমাদের সকলকে ঈমানের দাবী অনুযায়ী সামগ্রিক জীবন পরিচালনার তাওফিক দিন। আমীন।

প্রকাশক

মুহাম্মদ লোকমান হোসাইন

সূচিপত্র

বিষয়	*পৃষ্ঠা*

ঈমানের অর্থ ও মর্ম

ঈমানের দাবী এ প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গেলে আমাদেরকে প্রথমে জানতে হবে ঈমান বলতে কি বুঝায়।

ঈমান অর্থ কোন কিছুকে নির্ভুল ও সত্য মনে করে তা মনে প্রাণে বিশ্বাস করা। পরিভাষা হিসেবে ঈমান শব্দটির অর্থ হচ্ছে আল্লাহ্ ও তাঁর দ্বীনে হক্ ইসলামকে সত্য ও চিরন্তন বলে মনে প্রাণে বিশ্বাস করা। তার সাথে বিশ্বাস করা আখিরাত, রিসালাত, আল্লাহ্র সকল ফেরেশ্তা ও তাঁর নাযিল করা সকল আসমানী কিতাব।

আল্লাহকে বিশ্বাস করা বা আল্লাহর উপরে ঈমান আনার অর্থ তাঁকে তাঁর যাবতীয় গুণাবলীসহ বিশ্বাস করা। অর্থাৎ তিনিই সমুদয় সৃষ্টির একমাত্র স্রষ্টা, প্রভু, বিশ্ব জাহানের সর্বশক্তিমান মালিক ও পরিচালক, মানুষের একমাত্র ইলাহ, বাদশাহ্, প্রতিপালক, শাসক ও আইনদাতা। সকল প্রকার স্তবস্তুতি, বন্দেগী, দাসত্ব-আনুগত্য একমাত্র তাঁরই জন্যে। তিনি আদি, অনন্ত এক ও একক। তিনি সর্বজ্ঞ। এমনি অসংখ্য গুণে তিনি গুণান্বিত। এসব গুণেরও তিনি একমাত্র অধিকারী। এ সব গুণে তাঁর নেই কোন শরীক, কোন প্রতিদ্বন্দ্বী।

আল্লাহ ও মানুষের মধ্যে সম্পর্ক হলো স্রষ্টা ও সৃষ্টের, প্রভু ও দাসের, বাদশাহ্ ও প্রজার, শাসক ও শাসিতের। মানুষকে প্রতি মুহূর্তে আল্লাহর আনুগত্য করতে হবে, তাঁরই শাসন মেনে চলতে হবে, তাঁরই কাছে ভক্তি-শ্রদ্ধায়, কৃতজ্ঞতায় মস্তক অবনত করতে হবে। তাঁরই গুণকীর্তন করতে হবে। তাঁকে সন্তুষ্ট করার জন্যে নিজের জীবন, ধন-সম্পদ উৎসর্গ করতে হবে।

আরেক দিক দিয়ে চিন্তা করলে এ কথা স্বীকার করতে হয় যে, ঈমান প্রকৃত পক্ষে আল্লাহ্ বান্দার মধ্যে প্রভু ও দাসের মধ্যে এবং বাদশাহ্ ও প্রজার মধ্যে একটা মজবুত চুক্তি। অর্থাৎ বান্দাহ্ আল্লাহর সাথে এ চুক্তিতে আবদ্ধ হচ্ছে এই বলে ঃ হে আল্লাহ্! তুমি আমার প্রভু বা মনিব এবং আমি তোমার বান্দাহ্ বা দাস, তুমি আমার বাদশাহ্ এবং আমি তোমার প্রজা। অতএব, আমি তোমার দাস হিসেবে এবং তোমার প্রজা হিসেবে তোমার সব আদেশ এবং সব আইন মেনে চলব সর্বদা এবং জীবনের সকল ক্ষেত্রে। চুক্তির এ অংশটুকু মেনে নিলে তা পরিপূর্ণ হবে না। তার সাথে এ কথাও বলতে হবে, হে আল্লাহ্! তুমি ছাড়া আর কারো হুকুম, শাসন এবং আর কারো আইন মেনে চলবো না। অর্থাৎ আল্লাহ বিরোধী সকল শক্তি ও সত্তার আধিপত্য ও আনুগত্য প্রত্যাখ্যান করে একমাত্র তোমারই প্রভুত্ব, কর্তৃত্ব, আনুগত্য ও আইন মনে প্রাণে মেনে নেব। এ শর্তে তোমার সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ হচ্ছি।

আল্লাহ বলেন -

وَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ -

অর্থাৎ যে তাগুতকে তথা খোদাদ্রোহী শক্তি ও তার হুকুম-শাসন ও আনুগত্য প্রত্যাখ্যান করলো এবং তারপর আল্লাহ্র উপর ঈমান আনলো। এর সহজ-সরল অর্থ, ঈমানের পূর্ব শর্ত হলো গায়রুল্লাহকে তথা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য সকল শক্তি ও সত্তাকে প্রত্যাখ্যান। এ কথাগুলো ছোট্ট একটি বাক্যে বলা হয়েছে ঃ তা হলো - "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্।"

ঈমানের উপর ঘণ্টার পর ঘণ্টা যতই আলোচনা করি না কেন, কিন্তু জীবনের কোন কোন ক্ষেত্রে যদি আল্লাহর হুকুম-শাসন মেনে চলি এবং বহু ক্ষেত্রে খোদা বিমুখ ও খোদাদ্রোহী শক্তির হুকুম-শাসন মেনে চলি, তাহলে তা হবে প্রকৃত ঈমানের পরিপন্থী এবং ঈমানের প্রতি প্রকাশ্য বিদ্রূপ। আল্লাহকে স্রষ্টা, রিজিকদাতা ও পালনকর্তা হিসেবে বিশ্বাস করা, সাথে সাথে তাঁকে আইনদাতা হিসেবে মানতে হবে। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে কিভাবে চললে তার ইহজীবন ও পরজীবন সুখী ও সুন্দর হবে তার জন্য আল্লাহ্ নির্ভুল আইন দিয়েছেন। এ নির্ভুল আইন প্রণেতা

একমাত্র তিনি, তাঁর আইন পরিহার করে, মানুষের মনগড়া আইন মনে চলে আল্লাহ্‌র সাথে মানুষকে তাঁর অংশীদার গণ্য করা হয় যাকে বলে শিরক্ যা ঈমানের বিপরীত।

মসজিদে নিয়মিত নামায পড়া এবং সমাজে প্রতিষ্ঠিত মানুষের আইন বিনা দ্বিধায় ও সন্তুষ্ট চিত্তে মেনে নেয়া ঈমানের পরিপন্থী কাজ।

তাঁর আইন, শাসন মানতে হলে তা যেমন ভালো করে জানা দরকার, তেমনি জানা দরকার তাঁর পূর্ণ পরিচয়। আরও জানা দরকার কিভাবে তাঁর বন্দেগী ও স্তবস্তুত করা যায়, কি কাজ করলে তিনি সন্তুষ্ট হবেন এবং কি করলে হবেন অসন্তুষ্ট। এ সব জানাবার জন্যে মানব জাতির সূচনা থেকেই আল্লাহ ব্যবস্থা করে রেখেছেন। তা হলো এই যে, তিনি যুগে যুগে সকল দেশে সকল জাতির মধ্যে এক একজন করে নবী রসূল পাঠিয়েছেন। তাঁকে আল্লাহ্ এসব বিষয়ে সরাসরি সকল জ্ঞান দান করেন, তাঁকে সকল ভুলের উর্ধ্বে রাখেন এবং প্রতি মুহূর্তে তাঁকে পথ প্রদর্শন করেন। এসব নবী-রসূলকেও সত্য বলে বিশ্বাস করতে হবে। অর্থাৎ তাঁদের উপরেও পূর্ণ ঈমান আনতে হবে। এই হলো রিসালাতের উপর ঈমান।

দুনিয়ার মানব জাতির কাছে লক্ষাধিক নবী-রসূল পাঠানো হয়েছে। সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (স)। আল্লাহ্‌র দ্বীনে হক 'ইসলাম' তাঁর মাধ্যমে পরিপূর্ণ রূপ গ্রহণ করেছে। তাঁকে বিশ্বাস করতে হবে সর্বশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ রসূল হিসেবে।

এমনিভাবে ঈমান অর্থ মৃত্যুর পর এক দ্বিতীয় জীবনের উপরও বিশ্বাস স্থাপন করা। এ দুনিয়ার জীবনই একমাত্র জীবন নয়। মৃত্যুর সাথে সাথে জীবনের শেষ – তা নয়। বরঞ্চ তারপরও জীবন চলতে থাকবে।

কিয়ামত ও হাশর

সমস্ত সৃষ্টি যেমন আল্লাহ্‌র, তেমনি তাঁরই নির্দেশেই একদিন এই আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং তন্মধ্যস্থ যাবতীয় সৃষ্টি ধ্বংস হয়ে যাবে। তারপর আল্লাহ্ তায়ালা এক জগত সৃষ্টি করবেন। তারপর আবার আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় মৃত্যুবরণকারী প্রতিটি মানুষ পুনর্জীবন লাভ করবে এবং আল্লাহর দরবারে তাদেরকে একত্র করা হবে।

একে বলে কিয়ামত। এখানে প্রতিটি মানুষের দুনিয়ার জীবনের হিসাব-নিকাশ নেয়া হবে। মানুষকে যে দায়িত্ব সহকারে দুনিয়ায় পাঠানো হয়েছিল, তা তারা ঠিক ঠিক পালন করেছে কিনা, আল্লাহ্‌র নির্দেশিত পথে জীবন যাপন করেছে, না ভ্রান্তপথে চলেছে তার পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসেব নেয়া হবে। একে বলে হাশর।

আখিরাত

এ হিসাব-নিকাশের পর যারা ভালো ও সৎ বলে প্রমাণিত হবে, তাদেরকে দেয়া হবে এক অফুরন্ত সুখের স্থান, যেখানে তারা বসবাস করতে থাকবে অনন্তকাল ধরে। যাকে বলা হয় জান্নাত বা বেহেশ্‌ত।

পক্ষান্তরে যারা অসৎ , পাপী ও খোদাদ্রোহী বলে প্রমাণিত হবে, তাদের বাসস্থান হবে জাহান্নাম। যা এক অতীব দুঃখ-কষ্টের স্থান। এখন থেকে মানুষের জীবন হবে এক চিরন্তন জীবন যার শেষ নেই, অন্ত নেই। একে বলা হয় আখিরাত।

ফিরিশতা

আল্লাহ্‌র অসংখ্য অগণিত ফিরিশতা আছেন। তাঁরা সকলেই আল্লাহ্‌র আজ্ঞাবহ দাস। বরঞ্চ আদেশ পালন করাই তাঁদের প্রকৃতি ও স্বভাব। তাঁরা সর্বদা আল্লাহ্‌র স্তবস্তুতিতে মগ্ন আছেন। আবার তাঁদের অনেকের উপরে এই বিশ্ব প্রকৃতি পরিচালনার ভার ন্যস্ত আছে। আল্লাহ্‌র ইচ্ছানুযায়ী তাঁরা এ পরিচালনা করে থাকেন। এদের উপরও পূর্ণ ঈমান আনতে হবে।

আসমানী কিতাব

তারপর আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর নির্দেশনামা সম্বলিত আসমানী কিতাব পাঠিয়েছেন তাঁর নবী-রসূলগণের কাছে। এগুলোর উপরেও পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। সর্বশেষ আসমানী গ্রন্থ 'আল-কুরআন' যা নাযিল করা হয়েছিল সর্বশেষ নবী ও রসূল হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (স)-এর উপরে।

ঈমান বা বিশ্বাস স্থাপন শুধু মনে মনে করলেই তা যথেষ্ট হবে না, মৌখিক স্বীকৃতি ও ঘোষণা প্রয়োজন। একটি পবিত্র কালেমা উচ্চারণের মাধ্যমে ঈমানের ঘোষণা ও স্বীকৃতির প্রয়োজন হয়।

এ কালেমাটিকে (বাক্য) কুরআনে 'কালেমায়ে তাইয়্যেবা' বলা হয়েছে। তা হলো, "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ"।

এর সংক্ষিপ্ত অর্থ হলো, এ কথা ঘোষণা করা যে, আল্লাহ ব্যতীত এমন আর কেউ নেই, যে ইলাহ হতে পারে। যার কাছে মাথা নত করা যেতে পারে। যার আনুগত্য, বন্দেগী, দাসত্ব করা যেতে পারে। যার আইন-শাসন মানা যেতে পারে। যাকে স্রষ্টা, প্রভু ও প্রতিপালক মনে করা যেতে পারে। এ হলো কালেমাটির প্রথমাংশের অর্থ ও মর্ম।

দ্বিতীয়াংশে বলা হচ্ছে- মুহাম্মদ (স) আল্লাহ্র রসূল। অর্থাৎ গোটা মানব জাতির হেদায়েতের জন্য তিনি আল্লাহর প্রেরিত রসূল। আল্লাহ্র আনুগত্য, বন্দেগী, দাসত্ব ও তাঁর আইন-শাসন মেনে চলার ব্যাপারে তিনিই পন্থা বলে দেবেন। এ পথের প্রদর্শক তিনি। মানব জীবনের যাত্রাপথের নেতৃত্ব দিবেন তিনি। এ ব্যাপারে তিনি আল্লাহ্র প্রতিনিধিত্ব করবেন। স্বভাব-চরিত্র, আচার-আচরণ, ভালো-মন্দ তিনিই শিক্ষা দিবেন। তাঁর শিখানো নীতি ও দর্শনের ভিত্তিতেই গড়ে উঠবে মানবের তাহযিব-তামাদ্দুন্ সভ্যতা-ভব্যতা, শিল্পকলা, রুচি ও মননশীলতা। মোট কথা তিনি বিশ্বমানবতার একচ্ছত্র নেতা।

উপরে যা কিছু বলা হলো, তা হলো ঈমান ও ঈমানের মূলমন্ত্র কালেমায়ে তাইয়্যেবার সংক্ষিপ্ত মর্ম।

ঈমানের দাবী

এখন আমাদের আলোচ্য বিষয় হলো ঈমানের দাবী। তার অর্থ– ঈমান আনার পর ঈমান আনয়নকারীর মধ্যে কী পরিবর্তন বাঞ্ছনীয়। অবশ্যি ঈমান আনার পর তার মধ্যে কোন দৈহিক পরিবর্তন সম্ভবও নয় এবং বাঞ্ছনীয়ও নয়। ঈমান আনার পূর্বে যেমন মানুষটির দুটি হাত, দুটি পা, দুটি চোখ, দুটি কান, একটি নাক ও একটি মাথা ছিল; ঈমান আনার পর তার কোন কমবেশী হবে না। তার বর্ণেরও কোন পরিবর্তন হবে না। কিন্তু পরিবর্তন অবশ্যই হতে হবে তার মানসিকতার, মতবাদ ও চিন্তাধারার; তার স্বভাব-প্রকৃতির, চরিত্রের, আচার-আচরণের, রুচি ও মননশীলতার।

ঈমান মানুষটির মধ্যে নিয়ে আসে একটি মানসিক বিপ্লব। যার মন -মস্তিষ্ক ছিল জাহেলিয়াত ও অন্ধ-কুসংস্কারে তমসাচ্ছন্ন, ঈমান আনার পর তার মন-মস্তিষ্ক ইসলামের জ্যোতিতে হবে উদ্ভাসিত। ঈমান আনার আগে যে করতো বহু খোদার বন্দেগী, তার মস্তক ঈমান আনার পর কখনো অবনত হবে না আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো সামনে। বাতিল ও খোদাদ্রোহী তাগুতের আনুগত্য পরিত্যাগ করে একমাত্র আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্যের জন্য সে বিসর্জন দেবে নিজের পরিপূর্ণ সত্তাকে। লম্পট, ব্যাভিচারী, মিথ্যাবাদী, পরস্বাপহারী ও দুষ্কৃতকারী ঈমান আনার পর হয়ে পড়বে সৎ, সত্যবাদী, পূণ্য-পুত চরিত্রের অধিকারী, দাতা, দয়ালু ও পরোপকারী।

নামায-রোযা প্রভৃতি ঈমানের সর্বপ্রথম দাবী

ঈমান আনার সাথে সাথেই একজন মু'মিনের জন্য অপরিহার্য হয়ে পড়ে কতকগুলো কাজ সমাধা করা। এগুলো তার ঈমানের বহিঃপ্রকাশ, ঈমানের সাক্ষ্য। তা হলো, নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত নামায ও তা জামায়াতের সঙ্গে আদায় করা, রমযানের রোযা রাখা, মালদার হলে যাকাত আদায় করা এবং হজ্ব করা। কিন্তু এ সব করার পরও যদি তার মন মানসিকতায় পরিবর্তন না হয়, পরিবর্তন যদি না হয় তার স্বভাব-চরিত্রের; তাহলে বুঝতে হবে তার নামায, রোযা, যাকাত, হজ্ব প্রভৃতি চরিত্র গঠনমূলক কাজগুলো তার সর্বাঙ্গ সুন্দর হয়নি এবং তা কবুল হয়নি আল্লাহর দরবারে। এতে করে ঈমানের চাহিদাও তার মোটেই পূরণ করা হয়নি।

অনেকে মনে করে থাকেন, উপরে বর্ণিত কয়েকটি কাজ যেমন নামায, রোযা, যাকাত, হজ্ব পালন করলেই তাকে পূর্ণ মু'মিন বলা হবে। এইতো যথেষ্ট। আর কি চাই?

সকলের জন্য নামায-রোযা এবং মালদারের জন্য যাকাত-হজ্ব ফরয করা হয়েছে। এগুলো ব্যতীত কারো মু'মিন হওয়ার তো ধারণাই করা যেতে পারে না। ইসলামরূপ প্রাসাদের ভিত্তি স্তম্ভ বলা হয়েছে এগুলোকে। ভিত্তি ব্যতীত প্রাসাদের কল্পনাই তো করা অবান্তর। কিন্তু তাই বলে ভিত্তিই কি প্রাসাদ হতে পারে? ভিত্তির উপরে আরও বহু কিছু গড়ে তুললে তখনই তাকে বলা হবে প্রাসাদ। সে জন্য একজন মু'মিনের কাজ শুধু প্রাসাদের ভিত্তি তৈরি করেই নিশ্চিন্তে বসে থাকা নয়। অর্থাৎ নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাত প্রভৃতি সমাধা করলেই তার কাজ শেষ হয়ে যায় না। তার ঈমান তাকে আরও বহু কিছু করার দাবী করে। ঈমান যা যা করতে দাবী করে একেবারে সাধ্যের অতীত না হলে, তা যদি করা না হয়, তাহলে বলতে হবে তার পরিপূর্ণ মু'মিন হওয়ায় বেশ ত্রুটি রয়ে গেছে।

এখন ঈমানের দাবী কি কি যা পালন করলে একজনকে পরিপূর্ণ মু'মিন বলা যেতে পারে? নামায, রোযা, হজ্ব-যাকাত প্রভৃতিও ঈমানের দাবী সন্দেহ নেই। কিন্তু এতটুকুতেই তার দাবী শেষ হয়ে যাচ্ছে না। তাই আমাদের সম্মুখে অগ্রসর হতে হবে।

এর জন্য সর্বপ্রথম কুরআনে হাকীমের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হবে। কুরআনের পাতায় পাতায় মু'মিনের কর্তব্যের কথা সুস্পষ্ট করে বলে দেয়া হয়েছে।

তারপর এ কুরআনকে বাস্তবে রূপ দিয়েছেন আল্লাহ্‌র শেষ নবী মুহাম্মদ মুস্তাফা (স) তাঁর জীবনের বাস্তব কর্মপন্থা দিয়ে। তাই নবীর গোটা জীবন কুরআন পাকেরই পূর্ণ আলেখ্য। তারপর আসে সাহাবায়ে কিরামের জীবন চরিত্র।

অতএব, ঈমানের দাবী পুরোপুরি পালন করতে হলে একদিকে যেমন কুরআন থেকে এ সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান লাভ করতে হবে। অপরদিকে, নবী করিম (সা) ও সাহাবায়ে কিরামের জীবন চরিত্রের পরিপূর্ণ অনুসরণ ও অনুকরণ করতে হবে।

পূর্ণ মু'মিন হওয়ার জন্য নবী জীবনের অনুকরণ একেবারে অপরিহার্য। তাই আল্লাহ্‌ তায়ালা ঘোষণা করেছেন –

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْاٰخِرَ - (الاحزاب : ٢١)

– প্রকৃত পক্ষে তোমাদের জন্য সর্বোত্তম আদর্শ রয়েছে আল্লাহ্‌র রসূলের মধ্যে। এ আদর্শ প্রত্যেক ঐ ব্যক্তির জন্য যে আল্লাহকে পাবার এবং আখিরাতের নাজাত লাভ করার আশা পোষণ করে। (আহযাব ঃ ২১)

এ আয়াতটি আহ্‌যাব যুদ্ধের পর পর নাযিল হয়েছে। উহুদ থেকে শুরু করে আহ্‌যাব যুদ্ধ পর্যন্ত গোটা পরিস্থিতিকে সামনে রেখে রসূল (স)-এর আচার-আচরণ, চরিত্র ও কর্মপদ্ধতিকে এখানে সর্বোত্তম নমুনা হিসেবে ঘোষণা করা হচ্ছে। এর উদ্দেশ্য হলো ঐ সব লোকদের শিক্ষা দেয়া, যারা আহ্‌যাব যুদ্ধের সময় পার্থিব স্বার্থের দ্বারা পরিচালিত হয়ে অপরের মধ্যে বিভ্রান্তি ছড়াবার চেষ্টা করেছিল। তাদেরকে বলা হচ্ছে, তোমরা তো ঈমান, ইসলাম এবং রসূলের আনুগত্যের কথা ফলাও করে বলে থাক। কিন্তু তোমাদের এ কথা ভালো করে জেনে রাখা দরকার যে, যে রসূলের অনুসারীদের মধ্যে তোমরা শামিল হয়েছো বলছো সে রসূলের আচরণ কি ছিল? যদি কোন দলের নেতা আরাম প্রিয়তার

পরিচয় দেয়, ব্যক্তিগত স্বার্থকে প্রাধান্য দেয় এবং বিপদের সময় পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে, তাহলে তাঁর অনুসারীদের মধ্যে দুর্বলতা দেখা দেয়াটা যুক্তিসঙ্গত হতে পারে। কিন্তু রসূলে পাকের (স) অবস্থা এই ছিল যে, তিনি অপরকে যেমন বিপদের ঝুঁকি নিতে উদ্বুদ্ধ করেছেন, নিজেও সেই ঝুঁকি নিয়েছেন। এবং তার জন্য তিনি ছিলেন সকলের পুরোভাগে। এমন কোন দুঃখ-কষ্ট, অত্যাচার-নির্যাতন ছিল না, যা অপরে ভোগ করেছে আর তিনি তা করেননি। খন্দকের খোদাই কাজে তিনি নিজে অংশ গ্রহণ করেছেন। এ ব্যাপারে দুঃখ-কষ্ট, ক্ষুধা-তৃষ্ণায় তিনি সমানভাবে অপরের সাথে শরীক হয়েছেন। অবরোধকালে তিনি সব সময় যুদ্ধের সম্মুখভাবে অবস্থান করতেন এবং এক মুহূর্তের জন্যও দুশমনের মুকাবিলা থেকে পশ্চাৎপদ হননি। বনি কুরাইজার বিশ্বাসঘাতকতার পর মুসলমানদের পরিবার পরিজন যেভাবে বিপন্ন হয়েছিল তার পরিবার পরিজনও অনুরূপভাবে বিপন্ন হয়েছিল। রসূল (স) মুসলিমদের একচ্ছত্র নেতা হওয়া সত্ত্বেও তাঁর পরিবারবর্গের নিরাপত্তার কোনই বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়নি। যে মহান উদ্দেশ্যের জন্য নবী অপরের কাছে অসীম ত্যাগ ও কুরবানী দাবী করছিলেন, তিনি সর্বদাই প্রস্তুত ছিলেন স্বয়ং সে কুরবানী দেয়ার জন্য এবং দিয়েছেনও। অতএব, যারাই তাঁর আনুগত্যের দাবীদার, তাদের উচিত নবীর প্রতিটি আচার-আচরণ সর্বোত্তম আদর্শ ও নমুনা হিসেবে গ্রহণ করে তার পূর্ণ অনুকরণ করা।

তৎকালীন অবস্থা ও পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে এই হলো আয়াতের মর্ম ও ব্যাখ্যা। কিন্তু এই মর্ম কোন বিশেষ অবস্থা ও কালের মধ্যেই সীমিত থাকার কথা নয়। যেহেতু কুরআন সর্বকালের মানুষের জন্য পথ প্রদর্শক, তাই এ আয়াতের দ্বারা রসূলের জীবনকে কিয়ামত পর্যন্ত সকল যুগের সকল মানুষের জন্য আদর্শ হিসেবে ঘোষণা করা হচ্ছে। মুসলমান প্রতিটি ব্যাপারে রসূলের জীবনকে নিজের জীবনের জন্য নমুনা হিসেবে গ্রহণ করবে এবং তারই ছাঁচে ঢেলে তৈরি করবে আপন চরিত্র।

এর থেকে জানা গেল, একজন মু'মিনের জীবনের লক্ষ্য হলো, তার জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে, প্রতি পদক্ষেপে, রসূল পাকের (স) চরিত্র, আচার-আচরণ ও কর্মপদ্ধতির পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসরণ ও অনুকরণ করা।

এটাই তার ঈমানের সর্ববৃহৎ দাবী। কুরআন অন্যত্র বলে ঃ

وَمَا اٰتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ ق وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا ج وَاتَّقُوا اللّٰهَ ط إِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ (الحشر : ٧)

আল্লাহ্‌র রসূল তোমাদেরকে যা কিছু দেন, তা গ্রহণ কর এবং যত কিছু থেকে দূরে থাকতে বলেন, তার থেকে নিজকে দূরে রাখ এবং ভয় কর আল্লাহকে। অবশ্যই আল্লাহ্ কঠোর শাস্তিদাতা। (হাশর ঃ ৭)

'যা কিছু দেন' কথার অর্থ হলো যে বিধান এবং জীবন সমস্যার যে সমাধান দেন। এ সব বিধান এবং সমাধান একজন মু'মিনের জন্য প্রতি মুহূর্তেই গ্রহণীয় এবং অবশ্য পালনীয়।

পক্ষান্তরে, যে সব বিষয় থেকে রসূল মু'মিনদেরকে বিরত থাকতে বলেন, তার থেকে বিরত থাকা অথবা কোনক্রমেই তা গ্রহণ না করাও ঈমানের দাবী। এ বিষয়ে নবী পাকের (স) এরশাদ হচ্ছে –

إِذَا اَمَرْتُكَ بِاَمْرٍ فَأْتُوْا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَمَا نَهَيْتُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوْهُ.

(بخارى - مسلم)

যখন আমি তোমাদেরকে কোন বিষয়ে আদেশ করি তখন তোমরা সাধ্যানুযায়ী তা পালন করবে। আর যে সব বিষয়ে থেকে তোমাদেরকে বিরত থাকতে বলি, সে সব থেকে দূরে থাকবে। (বুখারী ও মুসলিম)।

হাদীসটি বর্ণনা করেছেন হযরত আবু হুরাইরা (রা)।

হযরত ইবনে মাসউদ (রা) সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, একবার তিনি তাঁর এক বক্তৃতায় বলেন, "অমুক অমুক ফ্যাশনকারিণী মেয়েদের উপর আল্লাহ্‌র অভিসম্পাৎ।"

একথা শুনার পর জনৈক মহিলা জিজ্ঞাসা করলেন, "এমন কথা আপনি পেলেন কোথায়? কুরআনের কোথাও আমার এ ধরনের কিছু নজরে পড়েনি।"

ইবনে মাসউদ (রা) বললেন, "তুমি যদি কুরআন পড়তে তাহলে নিশ্চয়ই তার মধ্যে এ কথা পেয়ে যেতে। তুমি কি এ আয়াত পড়নি?

وَمَا اٰتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ ق وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ الخ ـ

মহিলাটি বললেন, "হ্যাঁ, নিশ্চয়ই পড়েছি।"

ইবনে মাসউদ (রা) বললেন, "নবী (স) এরূপ কাজ করতে নিষেধ করেছেন এবং বলেছেন যে, এ ধরনের ফ্যাশনকারিণীদের উপরে আল্লাহ্ অভিসম্পাৎ করেছেন।" (*)

মহিলাটি বললেন, "হ্যাঁ, এবার বুঝতে পেরেছি।"

(বোখারী, মুসলিম, মুসনাদে আহমদ, মুসনাদে ইবনে আবি হাতেম)।

যা হোক কুরআনে হাকীম ও নবীর হাদীস থেকে এ কথা প্রমাণিত হলো যে, নীতিগতভাবে নবী মুহাম্মদের (স) জীবন পদ্ধতি হলো মু'মিনদের অনুকরণীয়।

** আজকাল তথাকথিত মুসলিম নারীগণ শুধু নিত্যনতুন অত্যাধুনিক ফ্যাশনের প্রতিই আকৃষ্ট হচ্ছে না; বরঞ্চ তাদের অর্ধ উলঙ্গ পোষাক শালীনতা ও লজ্জাশীলতার সকল সীমা লঙ্ঘন করেছে। ঘরের বাইরে যখন তারা বের হয় তখন তাদের সাজ পোষাকের ফ্যাশন , যৌন আকর্ষণকারী অর্ধনগ্ন দেহ, নিজকে পুরুষের কাছে আকর্ষণীয় বানাবার প্রতিযোগিতা সমাজে ব্যাপক হারে যৌন উচ্ছৃঙ্খলার ইন্ধন যোগাচ্ছে। এর পরেও তারা নিজেদেরকে মুসলামান বলে।*

পরিতাপের বিষয়, এমনও কিছু লোক দেখা যায়, যার কপালে সেজদার চিহ্ন,মুখে দাড়ি ও মাথায় টুপি এবং মুসল্লি পরহেজগার বলে যে পরিচিত; সে যখন বাড়ির বাইরে বেরোয়, তখন তার সঙ্গে তথাকথিক আধুনিক বেপর্দা যুবতী বেপর্দা মেয়ে দেখতে পাওয়া যায়। ঈমানের দাবী পূরণ না করে এমন পরহেযগারীর কানা কড়িও মূল্য আছে কী?

–গ্রন্থকার

ঈমানের অগ্নি পরীক্ষা

এখন আমরা নবীর তেইশ বছর ব্যাপী নবী জীবনের পর্যালোচনা করে দেখি যে, এই তেইশ বছরের মধ্যে আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদেরকে সত্যিকার অর্থে আল্লাহ্‌র প্রিয় পাত্র বানাবার জন্য কি কি প্রেরণা দান করেছেন। অন্য কথায় ঈমানের অপরিহার্য দাবীগুলো কি ছিল।

আল্লাহর এরশাদ হচ্ছে –

اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُّتْرَكُوْا اَنْ يَّقُوْلُوْا اٰمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُوْنَ

(العنكبوت : ٢)

মানুষ কি এ কথা মনে করে আছে যে, আমরা ঈমান এনেছি– এতটুকু বললেই তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হবে এবং ঈমান এনেছে কিনা তা পরীক্ষা করে দেখা হবে না? (আনকাবুত ঃ ২)

একজন মু'মিনের কাছে ঈমানের দাবী কি ছিল, তা নবী (স) ও সাহাবায়ে কিরামের মক্কী জীবনের সূচনা থেকেই আল্লাহ সুস্পষ্টরূপে বলে দিয়েছেন।

যে অবস্থার প্রেক্ষিতে উপরের আয়াত নাযিল হয়েছিল তা হলো এই যে, মক্কায় যে ব্যক্তিই ইসলাম গ্রহণ করতো, তার উপরে সব রকমের বিপদের পাহাড় ভেঙে পড়তো। দরিদ্র অথবা ক্রীতদাস হলে অমানুষিক জুলুম নিষ্পেষণের শিকার হতো। দোকানদার ব্যবসায়ী হলে তার ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ করে দেয়া হতো এবং সে এক রকম আর্থিক সংকটের সম্মুখীন হতো। সম্ভ্রান্ত পরিবারের কেউ ইসলাম গ্রহণ করলে তারও অব্যাহতি ছিল না। নির্যাতন নিষ্পেষণে তারও জীবন অতিষ্ঠ করে

তোলা হতো। মুশরিক-কাফিরদের অত্যাচার-উৎপীড়নে মক্কায় এমন এক সন্ত্রাস ও বিভীষিকার সৃষ্টি হয়েছিল যে, কতিপয় মুসলমানকে ঈমান বাঁচাবার তাগিদে আবিসিনিয়ায় হিজরত করতে হয়েছিল।

অনেকে আবার নবীর সত্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া সত্ত্বেও ঈমান আনতে ভয় করতো। অনেকে ঈমান আনার পর অত্যাচার-উৎপীড়নের চাপে কাফিরদের কাছে নতি স্বীকার করতো। যদিও এহেন ভয়াবহ অবস্থায় সাহাবায়ে কিরামের মজবুত ঈমান তাঁদেরকে আপন সংকল্পে অবিচল রেখেছিল। তথাপি স্বাভাবিক মানবিক দুর্বলতার কারণে অনেকের মনে এক ভয়াবহ সন্ত্রাস সৃষ্টি হয়েছিল। তার বহিঃপ্রকাশ হয় একটি ঘটনার দ্বারা।

হযরত খাব্বাব বিন আরাত (রা) বলেন, "যে সময়ে আমরা মক্কায় কুরাইশদের অত্যাচারে অতিষ্ট হয়ে হয়েছিলাম, সে সময়ে একদিন দেখলাম নবী (স) কা'বা ঘরের দেওয়ালের ছায়ায় বসে আছেন। আমি বললাম, "হে আল্লাহ্‌র রসূল! আপনি আমাদের জন্য দোয়া করছেন না?"

"আমার কথায় নবীর মুখমণ্ডল রক্ত বর্ণ ধারণ করলো। বললেন, "তোমাদের পূর্বে যারা আল্লাহর দ্বীনের উপর ঈমান এনেছিল তাদেরকে অধিকতর নির্যাতনের সম্মুখীন হতে হয়েছে। তাদেরকে কাউকে জীবন্ত করাত দিয়ে চিরে দু'খণ্ড করা হয়েছে। কারো শরীরের জোড়ায় জোড়ায় তীক্ষ্ণ লৌহ বিদ্ধ করা হতো যাতে করে তারা ঈমান পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়। আল্লাহর কসম! আমরা অবশ্য অবশ্যই সফলতা লাভ করব। তখন অবস্থা এমন হবে যে, এক ব্যক্তি সান্‌য়া থেকে হাজরামাওত পর্যন্ত নির্ভয়ে ভ্রমণ করবে এবং একমাত্র আল্লাহ্‌ ছাড়া তার ভয় করার আর কেউ থাকবে না।"

এ হাদীসটি লিপিবদ্ধ করেছেন বোখারী, মুসলিম, আবু দাউদ এবং নাসায়ী।

এ সন্ত্রাস ও বিভীষিকাময় পরিস্থিতিকে অসীম ধৈর্য সহকারে নীরবে মেনে নেয়ার জন্য আল্লাহ্‌ তায়ালা ঈমানদারদের হৃদয়ে এ সত্য প্রতিফলিত করেছেন যে, দুনিয়া এবং আখিরাতের সাফল্যের যে ওয়াদা তিনি করেছেন, শুধু শুধু ঈমানের মৌখিক দাবী করেই তা লাভ করা কিছুতেই সম্ভব নয়। তার জন্য অগ্নি পরীক্ষার ভেতর দিয়ে অতিক্রম করেই ঈমানের দাবীর সত্যতা প্রমাণ করতে হবে।

বেহেশত এত সহজে লাভ করার বস্তু নয় এবং দুনিয়াতেও আল্লাহ্র খাস নেয়ামতসমূহ এমন সহজলভ্য নয় যে, ঈমান আনার ঘোষণা করা মাত্রই তা লাভ করা যাবে। লাভ করা জন্য শর্ত হচ্ছে অগ্নিপরীক্ষা।

ঈমান আনার সাথে সাথেই বহু কিছু গ্রহণ ও বর্জন করতে হয়। গ্রহণ ও বর্জনের সর্বপ্রথমে সংঘাত-সংঘর্ষ হবে প্রবৃত্তির সাথে। একজন মু'মিনকে প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে জয়ী হতে হবে।

ঈমান আনার পর আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য দুঃখ-কষ্ট এবং জান ও মালের ক্ষতি বরদাশত করতে হবে। ভয়-ভীতি, ক্ষুধা-তৃষ্ণা ও লোভ-লালসার দ্বারা পরীক্ষা করা হবে। প্রতিটি প্রিয় বস্তু, ভালোবাসার পাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য উৎসর্গ করতে হবে। এত সব করার পরই ঈমানের সত্যতা প্রমাণ করা সম্ভব হবে।

বলা বাহুল্য নবী (স) ও সাহাবায়ে কিরাম (রা) ঈমানের দাওয়াত দেয়া ও গ্রহণ করার পর মুহূর্ত থেকেই এসব অগ্নিপরীক্ষার ভেতর দিয়েই কালাতিপাত করেছেন।

তাহলে এ কথা দিবালোকের মতো পরিস্কার হয়ে গেল যে, ঈমান আনার পর ঈমানের সত্যতা প্রমাণ করাই হলো সর্বপ্রথম দাবী এবং এ সত্যতার প্রমাণ দিতে হবে অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে।

নবী ও সাহাবায়ে কিরামের মক্কী ও মদনী জীবনে আল্লাহ্ তায়ালা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পর্যায়ে ঈমানের মজবুতির জন্য তথা ঈমানকে বাস্তব জীবনে রূপায়িত করার জন্য যেসব এরশাদ করেছেন, দৃষ্টান্ত স্বরূপ তার কিছু উল্লেখ করা যাক।

মু'মিনের জন্যে আল্লাহ্র ভালোবাসা হবে সবকিছুর ঊর্ধ্বে

মনে রাখতে হবে যে, কালেমায়ে তাইয়্যেবার মাধ্যমে ঈমানের ঘোষণা ছিল প্রকৃতপক্ষে বাতিল শক্তির বিরুদ্ধে এক বিরাট চ্যালেঞ্জ স্বরূপ। সে জন্যে হক ও বাতিলের সংঘর্ষ ছিল অনিবার্য। এক দিকে আল্লায় অবিশ্বাসী, খোদাদ্রোহী ও আল্লাহ বিমুখ ইসলামের দুশমন শক্তি অপরদিকে মুষ্টিমেয় হক পুরস্ত ঈমানদারদের ইসলামী শক্তি। ইসলামী আদর্শের প্রতিষ্ঠা ও ইসলাম বিজয়ী হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এ উভয় শক্তির মধ্যে সর্বদা চলেছে প্রচণ্ড সংঘর্ষ ও যুদ্ধ বিগ্রহ। একটি ছিল আল্লাহ্র প্রিয় দল (হিযবুল্লাহ) এবং অপরটি ছিল শয়তানের দল (হিযবুশ শায়তান)– বাতিল

দর্শন ও মতবাদের দল। এমতাবস্থায় বাতিলের মুকাবিলায় মুসলমানদের ঈমানের দাবী ছিল আল্লাহ্‌র সঙ্গে তাদের সম্পর্ক সম্বন্ধ গভীর নিবিড় করা। প্রেম ভালোবাসা, ভক্তি-শ্রদ্ধা, আনুগত্য, ভয়-ভীতি একান্তভাবে আল্লাহ্‌ জন্য নির্দিষ্ট করে দেয়া।

এ ব্যাপারে আল্লাহ্‌র এরশাদ হচ্ছে –

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَنْدَادًا يُّحِبُّوْنَهُمْ كَحُبِّ اللّٰهِ ط وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَشَدُّ حُبًّا لِّلّٰهِ ط (البقرة : ١٦٥)

কিছু লোক এমনও আছে যারা আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্যান্যদের তাঁর শরীক ও প্রতিদ্বন্দ্বী বানিয়ে নেন এবং তাদের প্রতি এতটা প্রেমানুরাগী হয় যতটা হওয়া উচিত ছিল আল্লাহ্‌র প্রতি। পক্ষান্তরে যারা আল্লাহ্‌র উপর ঈমান এনেছে তারা আল্লাহ্‌কে সব কিছু থেকে অধিক ভালোবাসে। – (বাকারাহ ঃ ১৬৫)

অর্থাৎ ঈমানের দাবী হচ্ছে এই যে, একজন মু'মিনের জন্য আল্লাহ্‌র ভালোবাসা অন্যান্য সকল ভালোবাসার উপরে প্রাধান্য লাভ করবে। কোন কিছুর ভালোবাসাই মু'মিনের মনে এমন স্থান লাভ করতে পারবে না যা আল্লাহ্‌র ভালোবাসার জন্য নির্ধারিত এবং তাঁর সন্তুষ্টি লাভের কেবল সেই ভালোবাসা পোষণ করা যায়। *

** আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্যান্যের প্রতি প্রেমানুরাগী তো কাফির মুশরিকরাই হতে পারে। কিন্তু মুসলিম নামে পরিচিত কিছু লোকের মধ্যেও এ ধরনের মানসিকতা লক্ষ্য করা যায়। এদের অনেকে নামায-রোযা, কালেমার যিকর প্রভৃতিও করে এবং আল্লাহ্‌ ও রসূলের প্রতি গভীর প্রেমানুরাগের মহড়াও করে। কিন্তু এদের সম্পর্ক ফাসিক-ফাজির-কাফির মুশরিকদের সাথে। তাদেরকে তুষ্ট রাখার জন্য তারা সর্বদা ব্যস্ত থাকে। তাদেরকে তুষ্ট করলে যেহেতু তাদের পার্থিব স্বার্থ হাসিল করা যায়, সে জন্য আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টির পরোয়া না করেও তারা এসব গায়রুল্লাকে (আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্যান্যকে) সন্তুষ্ট রাখার জন্য ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ে। তাদের আনুগত্য করতে গিয়ে আল্লাহ্‌র নাফরমানীতে লিপ্ত হয়। আল্লাহর আইন কানুনকে পদদলিত করে যারা নিজেদের রচিত আইন-কানুন সমাজে চালু করে, তাদের সাথে এদের দহরম-মহরম রাখতে হয়। নতুবা তারা তাদের হালুয়া রুটি বন্ধ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা করে।*

জীবন ও ধন-সম্পদ আল্লাহ্‌র নিকট সমর্পণ ঈমানের পরিচয়

মানুষ দুনিয়ার মধ্যে সবচেয়ে ভালোবাসে তার জীবনকে এবং তারপর তার ধন-সম্পদকে। কিন্তু একজন মু'মিন তার জীবন ও ধন-সম্পদ আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের জন্য অকাতরে উৎসর্গ করবে, এই হচ্ছে তার ঈমানের দাবী।

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ط

(التوبة : ١١١)

– প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ তায়ালা মু'মিনদের কাছ থেকে বেহেশতের বিনিময়ে তাদের জান ও মাল খরিদ করে নিয়েছেন। (সূরা আত-তাওবা ঃ ১১১)

যে ঈমানের মাধ্যমে আল্লাহ্ এবং বান্দাহ্‌র মধ্যে একটা সম্পর্ক স্থাপিত হয়, তাকে এ আয়াতে প্রকৃতপক্ষে একটা ক্রয়-বিক্রয় বলা হয়েছে। অর্থাৎ ঈমান নিছক একটি বিশ্বাসমূলক মতবাদই নয়, বরঞ্চ একটি পবিত্র চুক্তি যার মাধ্যমে বান্দাহ্ তার জান ও মাল তার স্রষ্টা ও মালিক প্রভু আল্লাহ্‌র নিকটে বিক্রি করে দেয়। তার বিনিময়ে সে আল্লাহ্‌র কাছ থেকে এ প্রতিশ্রুতি লাভ করে যে, মরণের পর দ্বিতীয় জীবনে তাকে বেহেশত দান করা হবে। এ কেনা-বেচার মর্ম বুঝতে হলে এর বিশদ বিশ্লেষণ প্রয়োজন।

প্রকৃত ব্যাপার তো এ ছাড়া আর কিছু নয় যে, মানুষের জীবন ও ধন-সম্পদের মালিক একমাত্র আল্লাহ তায়ালা। কারণ মানুষের জীবন ধন-সম্পদ ও জীবন ধারণের

প্রয়োজনীয় সব কিছু বস্তু সামগ্রীর স্রষ্টা একমাত্র আল্লাহ্। এদিক দিয়ে দেখতে গেলে বেচা-কেনার প্রশ্নই আসে না। মানুষের তো এমন কিছু নেই যা সে অপরের কাছে বিক্রি করতে পারে এবং আল্লাহ তায়ালারও সৃষ্টি ও মালিকানা বহির্ভূত এমন কিছু নেই যা তিনি ক্রয় করতে পারেন। তাহলে এ বেচা কেনার অর্থ কী?

ব্যাপার হচ্ছে এই যে, মানুষের মধ্যে এমন এক বস্তু আছে যা আল্লাহ্ মানুষের দায়িত্বে ছেড়ে দিয়েছেন। আর সেটা হলো মানুষের স্বাধীন এখতিয়ার। অর্থাৎ তার স্বাধীন ইচ্ছা ও কোন কিছু গ্রহণ-বর্জন ও করা না করার স্বাধীনতা (Freedom of will & Freedom of choice)। এতে করে অবশ্যি আসল সত্য পরিবর্তন হয়ে যায় না। অর্থাৎ জান ও মালের মালিকানা আল্লাহরই রয়ে যায়। কিন্তু মানুষকে এ স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে যে, সে এ সত্যকে (সবকিছুর একচ্ছত্র মালিকানা আল্লাহ্‌র) স্বীকার করে নিতে পারে, অথবা অস্বীকারও করতে পারে। কিন্তু তার স্বাধীন এখতিয়ারের এ অর্থও হতে পারে না যে, মানুষ প্রকৃতপক্ষে তার জীবনে, তার দেহ ও মনের এবং এ সবের শক্তিসমূহের ও তার ধন-সম্পদের সে মালিক হয়ে পড়েছে। অতঃপর সে এগুলোকে যেভাবে খুশি সেভাবে ব্যবহার করবে। বরঞ্চ তার প্রকৃত অর্থ এই যে, তাকে শুধুমাত্র এ স্বাধীনতাটুকু দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন বাধ্যবাধকতা ব্যতিরেকেই নিজের জীবন ও আল্লাহ্ প্রদত্ত যাবতীয় ধন-সম্পদের উপর খোদার মালিকানার অধিকার ইচ্ছা করলে সে স্বীকার করে নেবে, অথবা নিজেই নিজের মালিক হয়ে বসবে এবং খোদার মুখাপেক্ষী না হয়ে ইচ্ছেমতো এ সব কিছু সে ব্যবহার করবে। এই হলো আসল কারণ যার জন্য কেনা-বেচার প্রশ্ন এসে যাচ্ছে। তাই বলে এই খরিদের অর্থ এই নয় যে, যে বস্তু মানুষের তা আল্লাহ খরিদ করেছেন। বরঞ্চ আসল ব্যাপার এই যে, মানুষের জান-মাল তার কাছে নিছক আমানত স্বরূপ রাখা হয়েছে। অতপর এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ আমানতদারীর ভূমিকা পালন করার স্বাধীনতা তাকে দেয়া হয়েছে। এখানে আল্লাহ্ তার কাছে এ দাবী করছেন যে, সে স্বেচ্ছায় ও সন্তুষ্টচিত্তে বাধ্যবাধকতার চাপে নয়, আল্লাহর জিনিস আল্লাহ্‌র বলে স্বীকার করে নিক এবং জীবনভর তার মালিক মোখতার হিসেবে নয়, নিছক একজন আমানতদার হিসেবে তার ব্যবহার স্বীকার করে নিক। খেয়ানত করার যে স্বাধীনতা তাকে দেয়া হয়েছে তা সে পরিত্যাগ করুক। এভাবে দুনিয়ার এ ক্ষণস্থায়ী জীবনে আল্লাহরই দেয়া স্বাধীনতাকে

যদি সে আল্লাহরই হাতে সমর্পণ করে, তাহলে প্রতিদান স্বরূপ আখিরাতে তাকে বেহেশতে স্থান দেয়া হবে। যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে এ ধরনের কেনা-বেচা করবে সেই প্রকৃতপক্ষে মু'মিন। ঈমান এ ধরনের কেনা বেচারই দ্বিতীয় নাম।

যে ব্যক্তি এ ধরনের কেনা-বেচাকে অস্বীকার করে অথবা নীতিগতভাবে এ কথা স্বীকার করার পর এমন আচরণ করে যা কেনা-বেচা না করার শামিল, তাহলে সে আলবৎ কাফির। কারণ ঈমান না থাকলে কাফির হওয়াটা অনিবার্য হয়ে পড়ে।

এ কেনা বেচার ব্যাপারটি আরও একটু পরিষ্কার করে বুঝে নেয়া দরকার।

এ কেনা-বেচার ব্যাপারে আল্লাহ্ তায়ালা মানুষকে দুটি বিরাট পরীক্ষার সম্মুখীন করেছেন।

(১) প্রথম পরীক্ষা এই যে, ইচ্ছা ও কর্ম স্বাধীনতা থাকা সত্ত্বেও সে এতটুকু শালীনতা ও ভদ্রতা প্রদর্শন করে কিনা যে, প্রকৃত মালিককে মালিক মনে করে নেবে এবং নিমকহারামী ও খোদাদ্রোহীতা থেকে বিরত থাকবে।

(২) দ্বিতীয় পরীক্ষা এই যে, তার জীবন ও ধন-সম্পদের বিনিময়ে সে নগদ কিছু পাচ্ছে না। বরঞ্চ মৃত্যুর পরের জীবনে পাওয়ার একটা প্রতিশ্রুতি মাত্র। এমতাবস্থায় সে আল্লাহর উপর এতটুকু আস্থা স্থাপন করতে পারে কি না যে, সুদূর ভবিষ্যতের এক প্রতিশ্রুতি পাওনার বিনিময়ে সে তার স্বাধীন মর্জি ও সাধ উৎসর্গ করে দিতে স্বেচ্ছায় সন্তুষ্ট চিত্তে রাজী থাকে।

(৩) দুনিয়ার যে ফিকহ্ শাস্ত্র অনুযায়ী ইসলামী সমাজ গঠিত হয় তার দৃষ্টিতে ঈমান তো শুধু কিছু আকীদাহ্ বিশ্বাসের স্বীকৃতি ও ঘোষণার নাম। অতঃপর শরীয়তের কাজী তাকে গায়ের মু'মিন (অমুসলিম) অথবা ইসলামী মিল্লাত থেকে বহিষ্কৃত বলে ঘোষণা করতে পারে না, যতক্ষণ না এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় যে ঈমানের ঘোষণার ব্যাপারে সে মিথ্যাবাদী। কিন্তু আল্লাহর নিকটে প্রকৃত ঈমানদার ত সেই ব্যক্তি যে তার ধ্যানধারণা ও কার্যকলাপের দ্বারা স্বাধীনতা ও এখতিয়ার মা'বুদের হাতে উৎসর্গ করে দেয় এবং তাঁরই সপক্ষে নিজের মালিকানার দাবী থেকে মুক্ত হয়ে যায়। এখন কোন ব্যক্তি যদি ইসলামী কালিমার স্বীকৃতি দান করে, নামায রোযা প্রভৃতি নিয়মিত পালন করতে থাকে। কিন্তু আপন দেহ-মনের, মস্তিষ্ক ও দৈহিক শক্তির, আপন ধন-সম্পদের ও উহার উপাদানের এবং আপন আয়ত্তাধীন

সমুদয় বস্তুসমূহের মালিক নিজেকেই মনে করে, তাহলে দুনিয়াতে তাকে মু'মিন বলা হোক না কেন আল্লাহর নিকটে সে গায়ের মু'মিন বলেই অভিহিত হবে। কারণ আল্লাহর সাথে সে ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তি মোটেই করেনি যাকে কুরআনের দৃষ্টিতে ঈমানের প্রকৃত গুঢ়তত্ত্ব বলা হয়েছে। আল্লাহর বাঞ্ছিত স্থানে জান-মাল উৎসর্গ করতে কুণ্ঠিত হওয়া এবং আল্লাহর অবাঞ্ছিত স্থানে তা উৎসর্গ করা এ উভয়বিধ আচরণ এমন যা এ কথা প্রমাণ করে যে, ঈমানের দাবীদার ব্যক্তি তার জান মাল আল্লাহর কাছে বিক্রি করেনি। অথবা বিক্রয় চুক্তির পর সে বিক্রীত বস্তুকে নিজের মনে করছে।

(৪) ঈমানের এ গুঢ়তত্ত্ব ইসলামী জীবন ও কুফরী জীবনকে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ আলাদা করে দেয়। একজন মুসলমান ত সেই যে সত্যিকার অর্থে আল্লাহর উপরে ঈমান এনেছে, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে মহান আল্লাহর মর্জির অধীন হয়ে কাজ করে এবং তার কাজ-কর্ম এবং আচার-আচরণে কোথাও কণামাত্র স্বেচ্ছাচারিতার ঝলক দেখতে পাওয়া যায় না। অনুরূপভাবে ঈমানদারদের নিয়ে যে দল গঠিত হয়, তারা সমষ্টিগতভাবেও কোন পলিসি, কোন রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত, তাহ্যিব-তামাদ্দুনের কোন রীতি-নীতি, কোন সামাজিক ও অর্থনৈতিক নিয়ম-পদ্ধতি এবং কোন আন্তর্জাতিক চুক্তি ও নীতিমালা আল্লাহর মর্জির বিপরীত অথবা শরীয়তী কানুনের বিপরীত গ্রহণ করতে পারে না। আল্লাহ্ থেকে স্বাধীন হয়ে কাজ করা এবং কোন কিছু করা না করার সিদ্ধান্ত আপন মর্জির উপর ছেড়ে দেয়া অবশ্যই কুফুরী দৃষ্টিভঙ্গি। এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি যারা রাখে তারা 'মুসলিম' নামে অভিহিত হোক অথবা 'অমুসলিম' নামে উভয়ই সমান।

(৫) এ বেচা-কেনার দৃষ্টিতে আল্লাহ্র যে মর্জির আনুগত্য একজন মু'মিনের জন্য অপরিহার্য, সে মর্জি মানুষের উদ্ভাবিত বা কল্পিত মর্জি হলে চলবে না। বরঞ্চ তা হতে হবে সেই মর্জি যা তিনি স্বয়ং ঘোষণা করেন। কোন কিছুকে নিজে নিজে মা'বুদের মর্জি বলে মনে করে তার আনুগত্য করা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্র মর্জির আনুগত্য হয় না, হয় আপন মর্জি বা প্রবৃত্তির আনুগত্য করা। আর এটা হবে বেচা কেনার চুক্তির সম্পূর্ণ পরিপন্থী। আল্লাহর সাথে সম্পর্কিত বেচা-কেনার চুক্তিতে সেই ব্যক্তি ও দল অবিচল আছে বলে মনে করতে হবে যে বা যারা তাদের গোটা জীবনের দৃষ্টিভঙ্গি সৃষ্টিকর্তার দেয়া কিতাব ও রসূলে খোদার সুন্নাহ্ অনুযায়ী গ্রহণ করে।

আশা করি বিষয়টি এবার পরিষ্কার হয়েছে, তবুও কিন্তু মনের কোণে একটি প্রশ্ন রয়ে যাচ্ছে, তার সঠিক জবাবও আমাদের জেনে রাখা দরকার।

সে প্রশ্নটি হলো এই যে, মু'মিন তার জীবন ও ধন-সম্পদ যে আল্লাহর কাছে অকাতরে বিক্রি করে দিল, তার মূল্য এ দুনিয়াতে না দিয়ে আখিরাতে দেয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়া হলো কেন?

এ প্রশ্নের জবাব এ ছাড়া আর অন্য কিছু হতে পারে না যে, বেহেশ্‌ত শুধুমাত্র এ চুক্তির বিনিময় নয় যার দ্বারা বিক্রেতা তার জানমাল আল্লাহর কাছে বিক্রি করে দিল। বরঞ্চ বেহেশত হবে তার আচরণের বিনিময়, যে আচরণ হবে তার এমন যে বিক্রেতা তার পার্থিব জীবনে তার বিক্রিত বস্তুর প্রতি তার স্বেচ্ছাচারমূলক ব্যবহার পরিত্যাগ করবে এবং প্রকৃত আমানতদার হিসেবে খোদারই মর্জি অনুযায়ী তা ব্যবহার করবে। অতএব, এ বিক্রয় কার্য সত্যিকার অর্থে সম্পন্ন হবে যখন বিক্রেতার পার্থিব জীবন শেষ হয়ে যাবে এবং এ কথা প্রমাণিত হবে যে সে বিক্রয় চুক্তি করার পর তার জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত বিক্রির শর্তাবলী অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছে। তার পূর্বে ন্যায়-নীতির দিক দিয়ে মূল্য পাওয়ার সে যোগ্যই হতে পারে না।

ক্রীত বস্তুর মূল্য প্রদান আল্লাহ্‌র এক বিশেষ অনুগ্রহ

এ কেনা-বেচাও ক্রীত বস্তুর মূল্য প্রদানের ব্যাপারে বান্দাহ্‌র প্রতি আল্লাহ্‌ তায়ালার এক বিশিষ্ট অনুগ্রহ দেখা যায়। তাহলো এই যে, নিজেরই গচ্ছিত বস্তু যখন খুশি তখন তিনি বান্দার নিকট থেকে নিয়ে নিতে পারেন। তার মূল্য বা বিনিময় আবার কেন? কিন্তু মেহেরমান আল্লাহ্‌ আপন জিনিস বান্দাহ্‌র নিকট ফেরৎ নিচ্ছেন এবং তার জন্য সর্বোচ্চ ও সর্বোৎকৃষ্ট মূল্য দিচ্ছেন। তা হলো বেহেশ্‌ত। এটা বান্দার প্রতি আল্লাহ্‌র খাস মেহেরবানী ছাড়া আর কী হতে পারে?

এ কথাটিকে এক প্রেমিক কবির ভাষায় কত সুন্দর করে ব্যক্ত করা হয়েছে! আল্লাহ্‌র পথে একজন শহীদের মনের কথা কবি তাঁর ভাষায় ব্যক্ত করে বলেছেন।

জান দিত দি হুই উসি কি থি
হক ত ইয়ে হ্যায় কে হক আদা না হুয়া।

– যে জীবন আল্লাহ্‌র পথে উৎসর্গ করলাম, সে তাঁরই দেয়া। সে জীবন তাকেই দেয়াতে আমার কোন বীরত্ব বাহাদুরী নেই। পক্ষান্তরে প্রকৃত ব্যাপার এই যে, জীবনভর তাঁর অগণিত নিয়ামত ভোগ করার পর তার হক আদায় করতে পারলাম না।

স্বতঃস্ফূর্তভাবে আল্লাহ্‌র জন্য জীবন উৎসর্গ করার পর আল্লাহ্‌ প্রেমিকের কী মহান পরিতৃপ্তি প্রকাশ! এই হলো প্রকৃত ঈমানের নিদর্শন।

বিক্রয় চুক্তিই চূড়ান্ত নয়

ঈমানের দাবী কি, তা উপরের আলোচনায় পরিষ্কার বুঝতে পারা গেল। এখন এ বিষয়ে আর কোন আলোচনার প্রয়োজন না থাকারই কথা। কারণ ঈমানের সবচেয়ে বড়ো দাবী মু'মিনের কাছে এই ছিল যে, সে তার সব কিছু আল্লাহ্‌র কাছে বিক্রি করে দেবে। এখন বিক্রি করার পর ঈমানের দাবী আর কি-ই বা থাকে?

তার জবাব হচ্ছে এই যে, উপরের আলোচনায় এও জানতে পারা গেল যে, জানমাল বিক্রি করে দেয়াটাই ঈমানের দাবীর চূড়ান্ত মীমাংসা নয়। কারণ বিক্রেতার কাছে তার বিক্রিত বস্তুদুটি এখনো রয়ে গেছে এবং জীবনভর তার কাছেই থাকবে। অতএব, স্বাভাবিকভাবেই ঈমানের দাবী পূরণও বাকী রয়ে যাচ্ছে। এখন দেখতে হবে যে সে বিক্রীত বস্তুর যথাযথ ব্যবহার করে কিনা যার উপর নির্ভর করছে তার মূল্য পাওয়া না পাওয়া। এখন বিক্রয় চুক্তি অক্ষরে অক্ষরে পালন করার জন্য ঈমান বার বার তার কাছে যে দাবী করতেই থাকবে, তারই কিছু সংক্ষেপে আলোচনা করা যাক।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِىَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيْهِ وَلَا خُلَّةٌ وَّلَا شَفَاعَةٌ ط (البقرة : ٢٥٤)

তোমরা যারা ঈমান এনেছ, জেনে রেখে দাও। তোমাদেরকে আমি যা কিছু ধন-দৌলত দিয়েছি তার থেকে আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় কর ঐ দিন (কিয়ামত) আসার পূর্বে, যেদিন না কোন বেচা-কেনা চলবে, না দোস্তি-মহব্বত আর না কোন সুপারিশ কোন কাজে আসবে। (বাকারাহ্ ঃ ২৫৪)

এখন দেখা গেল, খোদার সাথে একজন মু'মিনের বিক্রয় চুক্তি হওয়ার পর তার বিক্রীত সম্পদ আল্লাহ্র পথেই ব্যয় করার তাকীদ করা হচ্ছে। কারণ যে ধন-সম্পদ সে আল্লাহ্র কাছে বিক্রি করেছে, তা আইনগতভাবে একমাত্র আল্লাহ্রই পথে ব্যয় করা ব্যতীত তার গত্যন্তর নেই। যদি সে বাঞ্ছিত পথে তা ব্যয় না করে সঞ্চিত করে রেখে দেয়, অথবা অন্য কোন পথে ব্যয় করে, তাহলে সে ক্রেতার সঙ্গে প্রতারণা ও বিশ্বাসঘাতকতা করলো। এ ক্রেতা যেহেতু স্বয়ং আল্লাহ্ এবং যিনি নেহায়েৎ মেহেরবানী করে তার গচ্ছিত সম্পদ খরিদ করে নিচ্ছেন। অতএব, এ বিশ্বাসঘাতকতার মারাত্মক শাস্তিও আইনগতঃ তিনি দিতে পারেন এবং দেবেন। আল্লাহ্ বলেন –

وَالَّذِيْنَ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مِيْثَاقِهٖ وَيَقْطَعُوْنَ مَا أَمَرَ اللّٰهُ بِهٖ أَنْ يُّوْصَلَ وَيُفْسِدُوْنَ فِى الْأَرْضِ لا أُولٰئِكَ لَهُمْ سُوْءُ الدَّارِ ـ (الرعد : ٢٥)

– যারা আল্লাহ্র সাথে চুক্তি সুদৃঢ় করার পর তা ভঙ্গ করে, যে সম্পর্ক স্থাপনের আদেশ তিনি দিয়েছেন, তা ছিন্ন করে এবং যমীনে বিপর্যয় ছড়ায়, তারা অভিসম্পাতের যোগ্য এবং আখিরাতে তাদের জন্য রয়েছে নিকৃষ্ট আবাসস্থল। (রা'দ ঃ ২৫)

আল্লাহ্ আরও বলেন –

اَلَّذِيْنَ يُوْفُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلاَ يَنْقُضُوْنَ الْمِيْثَاقَ ـ وَالَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ مَا أَمَرَ اللّٰهُ بِهٖ أَنْ يُّوْصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ يَخَافُوْنَ سُوْءَ الْحِسَابِ ط وَالَّذِيْنَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَأَنْفَقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَّعَلاَنِيَةً وَّيَدْرَءُوْنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ ـ (الرعد : ٢٠ - ٢٢)

(ঈমানদারদের কাজ ত এই যে) তারা আল্লাহ্‌র সাথে সম্পাদিত চুক্তি পূরণ করে, তা সুদৃঢ় করার পর ভঙ্গ করে না। আল্লাহ্‌ যে যে সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখার আদেশ করেন তা অক্ষুণ্ন রাখে এবং নিজেদের প্রভূকে ভয় করে এবং এ ভয়ও তারা করে যে কি জানি হয়তো মন্দভাবে এবং কঠোরতার সাথে তাদের হিসেব নেয়া হবে। তাদের চরিত্রের আর একটি দিক এই যে, একমাত্র আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য ধৈর্যশীল হয়ে পড়ে, নামায কায়েম করে, আমি আল্লাহ্‌ তাদেরকে যা দিয়েছি তার থেকে প্রকাশ্যে এবং গোপনে আল্লাহর পথে ব্যয় করে এবং ভালোর দ্বারা মন্দকে প্রতিহত করে। আখিরাতের সুখের আবাসস্থল তাদেরই জন্য। (রা'দ ঃ ২০-২২)

উপরের আয়াত দুটিতে একত্রে দশটি ঈমানের দাবী পেশ করা হয়েছে।

* আল্লাহ্‌র সাথে সম্পাদিত চুক্তি পূরণ করা।
* চুক্তি ভঙ্গ না করা।
* আল্লাহর আদিষ্ট ও বাঞ্ছিত সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখা।
* আল্লাহকে ভয় করা।
* আখিরাতে হিসেবের কঠোরতার ভয় করা।
* আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনকে জীবনের লক্ষ্য মনে করা।
* ধৈর্যশীল হওয়া।
* নামায কায়েম করা।
* প্রকাশ্যে এবং গোপনে আল্লাহ্‌র দেয়া সম্পদ আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করা
* ভালোর দ্বারা মন্দকে প্রতিহত করা।

প্রকৃত মু'মিনের জন্য আখিরাতের বাসস্থান কেমন হবে তাও এ প্রসঙ্গে বলে দেয়া হয়েছে।

جَنّٰتُ عَدۡنٍ يَّدۡخُلُوۡنَهَا وَمَنۡ صَلَحَ مِنۡ اٰبَآئِهِمۡ وَاَزۡوَاجِهِمۡ وَذُرِّيّٰتِهِمۡ وَالۡمَلٰٓئِكَةُ يَدۡخُلُوۡنَ عَلَيۡهِمۡ مِّنۡ كُلِّ بَابٍ ـ سَلٰمٌ عَلَيۡكُمۡ بِمَا صَبَرۡتُمۡ فَنِعۡمَ عُقۡبَى الدَّارِ ـ (الرعد : ٢٣-٢٤)

অর্থাৎ বাসস্থানটি হবে এমন বাগান (জান্নাত) যা হবে তাদের চিরন্তন বাসস্থান। তারা নিজেরা প্রবেশ করবে সে জান্নাতে এবং তাদের মা-বাপ, স্ত্রী-পুত্র পরিজনের মধ্যে যারা নেক হবে তারাও তাদের সঙ্গে প্রবেশ করবে সে জান্নাতে। ফেরেশতাগণ চারদিক থেকে ছুটে আসবেন তাদের খোশ আমদেদ জানাবার জন্য। তারা বলবেন, "আপনাদের উপরে শান্তি বর্ষিত হোক। কারণ আপনারা দুনিয়াতে ধৈর্যের সাথে আল্লাহর পথে কাজ করেছেন। তার জন্য এ স্থানের প্রকৃত যোগ্যই আপনারা।" কত সুন্দর আখিরাতের এ আবাসস্থল! (রা'দ ঃ ২৩-২৪)

মানুষ তার ধন-সম্পদের প্রতিনিধি মাত্র

মানুষকে আল্লাহ যে ধন-সম্পদ দান করেছেন, তার মালিকানা মানুষকে দেয়া হয়নি। এ সবের প্রতিনিধি করা হয়েছে মানুষকে। সম্পদের স্রষ্টা ও মালিক আল্লাহ্ তা মানুষের কাছে গচ্ছিত রেখে তার প্রতিনিধি বানিয়েছে মানুষকে এ শর্তে যে, মানুষ তা ব্যয় করবে আল্লাহরই মর্জি মুতাবেক।

আল্লাহ্ বলেন –

اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَاَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلَفِيْنَ فِيْهِ ط فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَاَنْفَقُوْا لَهُمْ اَجْرٌ كَبِيْرٌ ـ (الحديد : ٧)

– (হে মু'মিনগণ!) আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান আন এবং ব্যয় কর এ সব সম্পদ থেকে যার খলিফা বা প্রতিনিধি আল্লাহ তোমাদেরকে বানিয়েছেন। অতএব, যারা ঈমান আনবে এবং সম্পদ আল্লাহ্র পথে ব্যয় করবে, তাদের জন্য রয়েছে বিরাট প্রতিদান। (হাদীদ ঃ ৭)

এ আয়াতে মুসলমানদেরকেই ঈমান আনার কথা বলা হয়েছে। তার অর্থ ঈমান আনার পর ঈমানের দাবী পূরণ করে চলতে হবে। তারপর আল্লাহ্র পথে ধন-সম্পদ ব্যয় করার কথা বলা হয়েছে। এ আদেশ অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গত। কারণ

ধন-সম্পদের মালিক সে নয়। মালিক আল্লাহ্। সে তার প্রতিনিধি। প্রতিনিধির কাজ মালিকের মর্জি পূরণ করা। এ ধন যখন যেভাবে এবং যে পরিমাণে ব্যয় করলে আল্লাহ্র মর্জি পূরণ হবে ঠিক তেমনি ভাবেই তা ব্যয় করতে হবে।

আল্লাহ মু'মিনের কাছ থেকে তার জান ও মাল উভয়ই খরিদ করে নিয়েছেন। উপরে এর বিশদ আলোচনা হয়েছে। কিন্তু জানের চেয়ে মালের জন্য অধিকতর তাকীদ করা হয়েছে। তার অর্থ হলো, ঝোঁকের মাথায় হঠাৎ জানটা দিয়ে দেয়া তেমন কঠিন কাজ নয় এবং এটা মাত্র একবারই দেয়ার বস্তু। একবার দিলেই শেষ হয়ে যায়। কিন্তু ধন-সম্পদ বার বার এবং জীবনভর আল্লাহ্র পথে ব্যয় করা বড়ো কঠিন কাজ। তাই এর দ্বারা ঈমানের কঠিন পরীক্ষা হয়।

আল্লাহ পথে ব্যয়ের তাৎপর্য

এখন প্রশ্ন হলো এই যে, আল্লাহ্‌র পথে ব্যয়ের অর্থ ও তাৎপর্য কি এবং তার প্রয়োজনীয়তা-ই কি? আল্লাহ্‌র ত ধন-সম্পদের কোনই প্রয়োজন নেই। কারণ তিনিই ত সারা জাহানের স্রষ্টা ও মালিক। কেনই বা তিনি কুরআনের পাতায় তাঁরই ধন ব্যয় করার তাকীদ দিয়েছেন?

শুধু তাই নয়, তিনি তাঁর বান্দাহ্‌র কাছে ধন-সম্পদ ঋণস্বরূপ চেয়েছেন। যেমন– কুরআনে বলা হয়েছে –

مَنْ ذَا الَّذِىْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضٰعِفَهُ لَهُ وَلَهُ اَجْرٌ كَرِيْمٌ

(الحديد : ١١)

এমন কে আছে যে, আল্লাহকে ঋণ দান করবে উত্তম ঋণ? অতঃপর তিনি তা কয়েকগুণ বাড়িয়ে ফেরৎ দিবেন। শুধু তাই নয়, বরঞ্চ ঋণদাতার জন্য সর্বোৎকৃষ্ট প্রতিদানও রয়েছে। (হাদীদ -১৯)

وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاَقْرِضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا (المزمل : ٢٠)

এবং তোমরা নামায কায়েম কর, যাকাত দান কর এবং আল্লাহকে ঋণ দান কর, উত্তম ঋণ। (মুযাম্মিল ঃ ২০)

এ হচ্ছে আল্লাহ্ তায়লার বিরাট মহানুভবতা যে মানুষ যদি তাঁরই দেয়া সম্পদ তাঁরই পথে ব্যয় করে, তাহলে তিনি সেটাকে তাঁর জন্য ঋণ হিসেবে গণ্য করেন। তাই বলে শর্ত এই যে তা হতে হবে উৎকৃষ্ট ঋণ (কর্জে হাসানা)। অর্থাৎ তা দিতে

হবে খাঁটি নিয়তে এবং বিনা স্বার্থে। এ দেয়ার মধ্যে কোন প্রকার লোক দেখানোর মনোভাব, খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা লাভের কোন অভিলাষ যেন না থাকে। এ ঋণ দানে কারো প্রতি কৃপাপ্রদর্শন করা হয়েছে এমন মনে করাও চলবে না। নিছক আল্লাহ্ তায়ালার সন্তুষ্টি লাভের জন্য তা যেন দেয়া হয় এবং আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো প্রতিদান ও সন্তুষ্টি লাভ যেন অভিপ্রেত না হয়। এ ঋণ সম্পর্কে আল্লাহ্র দুটি প্রতিশ্রুতি। এক. এ ঋণকে কয়েকগুণ বর্ধিত করে প্রত্যাবর্তন করা হবে। দুই. উপরন্তু তিনি তাঁর পক্ষ থেকে সর্বোত্তম প্রতিদান দেবেন।

হযরত ইবনে মাসউদ (রা) থেকে একটি হাদীসে বর্ণিত আছে। বলা হয়েছে যে, যখন এ আয়াত নাযিল হয় এবং সাহাবীগণ তাঁর পবিত্র মুখ থেকে তা শুনতে পান, তখন হযরত আবু দাহ্ দাহ্ আনসারী (রা) আরজ করেন, "হে আল্লাহর রসূল সত্যিই কি আল্লাহ্ তায়ালা আমাদের নিকট থেকে ঋণ চাইছেন?"

নবী বললেন, "হ্যাঁ, আবুদ্দাহ্দাহ্' আবুদ্দাহ্দাহ্ বলেন, "আপনার হাত মুবারক আমাকে একটু দেখান।" নবী (স) তাঁর হাত তাঁর দিকে বাড়িয়ে দিলেন।

সাহাবী আবুদ্দাহ্দাহ্ নবীর হাত তাঁর হাতের মধ্যে নিয়ে বললেন, "আমি আমার বাগান আমার প্রভুকে ঋণ দিলাম।"

হযরত ইবনে মাসউদ (রা) বলেন যে, সেই বাগানে ছয়শত উৎকৃষ্ট খেজুর গাছ ছিল। সাহাবী আনসারীর বাড়ি ছিল সেই বাগানের মধ্যেই এবং তিনি সেখানেই তাঁর পরিবারসহ বাস করতেন।

নবীকে উক্ত কথা বলার পর তিনি সোজা তাঁর বাড়ি গিয়ে পৌঁছলেন এবং তাঁর স্ত্রীকে সম্বোধন করে বললেন, "দাহ্দাহ্র মা, বেরিয়ে এসো, বেরিয়ে এসো। এ বাগান আমি আমার প্রভুকে ঋণ দিয়েছি।"

তাঁর স্ত্রী বললেন, "দাহ্দাহ্র বাবা, তুমি বেশ মোটা মুনাফার সওদা করেছো।"

এ কথা বলে তিনি তাঁর ছেলে এবং ঘরের আসবাসপত্রসহ বেরিয়ে পড়লেন– (ইবনে আবি হাতেম)।

সত্যিকার মু'মিন সাহাবায়ে কিরামের (রা) চরিত্র, মন-মানসিকতা এবং আল্লাহ্‌র পথে ত্যাগ ও কুরবানী কতখানি ছিল তা এ ঘটনা থেকে স্পষ্ট বুঝতে পারা যায়। এর থেকে এ কথাও বুঝতে পারা যায় সে ঋণ (কর্জে হাসানা) কি ছিল যা কয়েকগুণ বর্ধিত করে প্রত্যাবর্তন করার এবং অতিরিক্ত প্রতিদান দেয়ার প্রতিশ্রুতি আল্লাহ্ দিয়েছেন।

এমনি ঋণ দানের জন্য কুরআনে আরও কয়েক স্থানে আহ্বান জানানো হয়েছে। ঋণ দান অর্থ আল্লাহ্‌র পথে অকাতরে এবং মুক্ত হস্তে অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করা। 'উত্তম ঋণ' অর্থ পার্থিব কোন স্বার্থের আশায় নয়।

নিছক আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের নিয়তে। এখন ঋণ দানের প্রকৃত মর্মও আমাদের জানা দরকার।

এ বিষয়টি সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে হলে নবীজীবনকে ভালো করে জানতে বুঝতে হবে। আমরা যদি নবী মুহাম্মদ (স) -এর তেইশ বছরের জীবনকে সামনে রাখি, তাহলে আমরা সম্পষ্টই দেখতে পাব যে, তাঁর তেইশ বছরের জীবন বাতিলের বিরুদ্ধে একটা একটানা সংগ্রামের ইতিহাস। এ সংগ্রামে অবশ্যি সাহাবায়ে কিরামও শামিল ছিলেন।

এ সংগ্রাম ছিল কিসের জন্য? এ ছিল আল্লাহ্‌র কালেমাকে বুলন্দ করার সংগ্রাম। তাঁর বাণীকে সমুন্নত করার সংগ্রাম।

রসূল আগমনের উদ্দেশ্য

আল্লাহ্‌র বাণীকে সমুন্নত করার অর্থ হলো তাঁর দ্বীনে হককে মানুষের জন্য একমাত্র সত্য, সনাতন, সুন্দর ও মঙ্গলকর জীবন ব্যবস্থা হিসেবে বিজয়ী ও প্রতিষ্ঠিত করার সংগ্রাম। বলা বাহুল্য নবী মুহাম্মদের (স) আগমন একমাত্র এই উদ্দেশ্যেই হয়েছিল।

هُوَ الَّذِىٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ ـ (الصف : ٩)

তিনি ত সেই সত্তা, যিনি তাঁর রসূলকে হিদায়েত এবং 'দ্বীনে হক' সহ পাঠিয়েছেন। উদ্দেশ্য হলো এই যে, রসূল সে দ্বীনে হককে, অন্যান্য সমুদয় 'দ্বীন' বা জীবন বিধানের উপরে বিজয়ী করবেন মুশরিকগণের বিরোধীতা করা সত্ত্বেও। (সাফ ঃ ৯)

রসূল তাঁর জীবনের মিশনকে অর্থাৎ 'দ্বীনে হক' বিজয়ী ও প্রতিষ্ঠিত করার কাজকে সাফল্যমণ্ডিত করতে গেলে, বাতিলের সঙ্গে সংগ্রাম-সংঘর্ষ যে অনিবার্য তার উপরের আয়াতে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত করা হয়েছে।

বাতিলপন্থী এটা কখনো মানতে রাজী হবে না যে, মানব জীবনের সর্বক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র 'দ্বীন' বা বিধান কায়েম হোক। তারা বড়ো জোর এমন

এক সমঝোতায় ত নেমে আসতে পারে যে, আল্লাহ্‌র বন্দেগী ও দাসত্ব আনুগত্যের সাথে অন্যান্যের দাসত্ব ও আনুগত্য চলুক। তারা চাইবে যে কোন দর্শন, মতবাদ ও দৃষ্টিভঙ্গীর উপরে তাদের ধর্মবিশ্বাস, চরিত্র ও তাহযিব তামাদ্দুনের

ভিত্তি গড়তে। কিন্তু রসূলের উপরে নির্দেশ হচ্ছে তাদের সাথে কোন প্রকার সমঝোতা না করেই, যে হেদায়েত ও 'দ্বীনে হক' আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তাঁর কাছে প্রেরিত হয়েছে, তা তিনি পরিপূর্ণ রূপে জীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করবেন। বাতিলপন্থী যতোই প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করুক, রসূলকে এ কাজ করতেই হবে। এমনকি এর জন্য সশস্ত্র সংগ্রামের সম্মুখীন হতে হলে তাও করতে হবে। এরশাদ হচ্ছে ঃ

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ ۔ (انفال : ٣٩)

– এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর যতোক্ষণ না ফেৎনার উচ্ছেদ হয় এবং 'দ্বীন' (জীবন বিধান) পরিপূর্ণরূপে আল্লাহ্‌র হয়ে না যায় (আন্‌ফাল ঃ ৩৯।

এখন বুঝতে পারা গেল, নবীর প্রতি আরোপিত মিশন সাফল্যমণ্ডিত করতে হলে ঈমানদারগণের অপরিহার্য কর্তব্য হচ্ছে বাতিলের বিরুদ্ধে একটানা সংগ্রাম করে চলা। এ সংগ্রামকে কোন বিশিষ্ট যুগ বা কালের জন্য নির্দিষ্ট করে রাখা হয়নি। আল্লাহ্‌র এ নির্দেশ মুসলমানদের জন্য এবং তা প্রযোজ্য কিয়ামত পর্যন্ত সকল কালের জন্য। যতোক্ষণ না আল্লাহ্‌র 'দ্বীন' পরিপূর্ণরূপে কায়েম হয়েছে, ততোদিন এ সংগ্রামের শেষ নেই, বিরতি নেই।

এ প্রসঙ্গে কুরআন আরও বলে –

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنْصَارَ اللَّهِ ۔ (الصف : ١٤)

তোমরা যারা ঈমান এনেছ, আল্লাহ্‌র সাহায্যকারী হয়ে যাও। (আছ্‌ ছফ ঃ ১৪)

'আল্লাহর সাহায্যকারী হওয়ার অর্থ আল্লাহ্‌র দ্বীন প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সকল দিক দিয়ে দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে সাহায্য করা। এখন বিষয়টি অধিকতর সুস্পষ্ট হয়ে গেল যে, 'দ্বীনে হক' প্রতিষ্ঠার জন্য বাতিলের বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম অনিবার্য, তার জন্য মুক্ত হস্তে অর্থ ও ধন-সম্পদ ব্যয় করা এবং দেহ ও মনের সকল শক্তি নিয়োজিত করাকেই আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় ও আল্লাহ্‌র দ্বীনের সাহায্য বলা হয়েছে।

মনে রাখতে হবে যে, আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ব্যতীত অন্য কোন অভিপ্রায়ে অর্থ ব্যয় করলে, তা যতো বেশি পরিমাণেই হোক না কেন এবং প্রকাশ্যত দ্বীন প্রতিষ্ঠার

কাজে দেয়া হোক না কেন, তাকে আল্লাহ্র পথে ব্যয় বলা যাবে না এবং সমুদয় অপচয়ের মধ্যেই শামিল হবে।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُبْطِلُوْا صَدَقٰتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْاَذٰى لا كَالَّذِىْ يُنْفِقُ مَالَهٗ رِئَاءَ النَّاسِ - (البقرة : ٢٦٤)

– হে ঈমানদারগণ! লোকের কাছে প্রচার করে বেড়িয়ে অথবা গ্রহণকারীকে মনে পীড়া দিয়ে তোমাদের সদ্কা-খয়রাত বরবাদ করো না। ঠিক তারই মতন যে শুধু লোক দেখানোর জন্য ব্যয় করে। (বাকারাহ্ : ২৬৪)

'সদ্কা' শব্দটি সিদ্ক থেকে উদ্ভূত। তার অর্থ 'সত্যতা' এবং 'আন্তরিকতা'। সদকা এ জন্য বলা হয়েছে যে তার দাতার ঈমানের সত্যতা ও আন্তরিকতা প্রমাণ করে।

আল্লাহ্র পথে ব্যয় যদি লোক দেখানোর জন্য অথবা কোন ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য হয়, (যেমন- বাহাদুরি বা নাম কেনার জন্য, অথবা ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর কোন ব্যক্তিগত পদমর্যাদা লাভ অথবা সুযোগ-সুবিধা হাসিলের জন্য) এবং তা যতো পরিমাণে হোক না কেন, তা সমুদয় অপচয় ব্যতীত আর কিছুই হবে না। তার কোন বিনিময় আল্লাহ্র কাছে পাওয়া যাবে না। বরঞ্চ অসৎ অভিপ্রায়ের জন্য শাস্তিই পেতে হবে। উপরের বিশদ আলোচনায় কয়েকটি বিষয় আমাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে গেল ঃ

* এ দুনিয়ায় নবী মুহাম্মদের (স) আগমনের একমাত্র উদ্দেশ্য হলো দ্বীনে হকের প্রতিষ্ঠা। তার জন্য বিরোধী বাতিল শক্তির সঙ্গে সংগ্রাম-সংঘর্ষ অনিবার্য।

* নবী মুহাম্মদ (স) এবং তাঁর পরে দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে সর্বোতভাবে সাহায্য করা অর্থাৎ এ সংগ্রামে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ করা ঈমানের দাবী ও শর্ত।

* এ কাজের জন্য জীবন ও ধন-সম্পদ উৎসর্গ করা ঈমানের দাবী।

* জীবন ও ধন-সম্পদ বিসর্জন দেয়ার ব্যাপারে নিয়ত পরিষ্কার রাখতে হবে। উদ্দেশ্য হবে একমাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন। মানব জাতির সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ্র বন্দেগী বা দাসত্ব-আনুগত্য করা। এ দাসত্ব-আনুগত্য পরিপূর্ণতা

লাভ করে যদি তা জীবনের সর্বক্ষেত্রে করা হয়। অন্য কথায় যাকে বলা হয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে দ্বীনে হক প্রতিষ্ঠা করা। এই হলো সৃষ্টির মূল লক্ষ্য। এই লক্ষ্যকে কেন্দ্র করেই আল্লাহ্‌র অন্যান্য নির্দেশ এসেছে। কুরআনের প্রতিটি নির্দেশ ঐ একটি লক্ষ্য কেন্দ্রের দিকেই আবর্তিত হচ্ছে। এ লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্য বান্দাহকে বহু কাজ অবশ্যই করতে হয়, যা না করলে কিছুতেই লক্ষ্যে পৌঁছানো যায় না।

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ.

(محمد : ٧)

– যারা ঈমান এনেছ তারা জেনে রাখ যে যদি তোমরা আল্লাহকে সাহায্য কর, তাহলে তিনিও তোমাদের সাহায্য করবেন এবং বাতিলের মুকাবিলায় তোমাদের হকের উপর অটল রাখবেন। (মুহাম্মদ ঃ ৭)

এখানেও 'আল্লাহ্‌র সাহায্য' অর্থ আল্লাহ্‌র 'দ্বীনে হক' প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করা। নিজের অর্থ, ধন-সম্পদ, শ্রম, মেহনত, প্রতিভা, চিন্তা-ভাবনা সব কিছুই এ কাজে পরিপূর্ণরূপে নিয়োজিত করা। একজন মু'মিনের কাছে এ দাবীই করা হচ্ছে।

বাতিলের সাথে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করা ঈমানের দাবী

একজন মু'মিনের জন্য এটাও অপরিহার্য যে, সে যখন 'দ্বীনে হক' প্রতিষ্ঠার একজন সৈনিক, তখন তাকে যুদ্ধে জয়লাভ করার জন্য শত্রুকে চিহ্নিত করে রাখতে হবে। তার শত্রু হলো বাতিলপন্থী। এ বাতিলপন্থীর সাথে তার সকল সম্পর্ক ছিন্ন করতে হবে। তাদের সাথে কোন প্রকারের বন্ধুত্বের সম্পর্ক রাখা চলবে না।

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُّؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ يُوَآدُّوْنَ مَنْ حَآدَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَلَوْ كَانُوْٓا اٰبَآءَهُمْ اَوْ اَبْنَآءَهُمْ اَوْ اِخْوَانَهُمْ اَوْ عَشِيْرَتَهُمْ ط اُولٰٓئِكَ كَتَبَ فِىْ قُلُوْبِهِمُ الْاِيْمَانَ وَاَيَّدَهُمْ بِرُوْحٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ط رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ ط اُولٰٓئِكَ حِزْبُ اللّٰهِ ط اَلَآ اِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ. (المجادلة : ٢٢)

– (হে মুহাম্মদ!) তুমি এমনটি কখনো পাবে না যে, যারা আল্লাহ্ এবং আখিরাতের উপর ঈমান রাখে, তারা বন্ধুত্ব রাখে এমন লোকের সাথে যারা আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের বিরোধিতা করে। এ বিরোধিতাকারী পিতা হোক, পুত্র হোক, ভাই হোক অথবা আপন স্বজন হোক না কেন। তারা (ঈমানদানগণ) এমন, যাদের অন্তরের মধ্যে আল্লাহ্ ঈমান দৃঢ়ভাবে অংকিত করে দিয়েছেন। অতঃপর তিনি তাঁর পক্ষ থেকে একটি আত্মা বা প্রাণশক্তি দান করে তাদের মধ্যে শক্তির সঞ্চার করেছেন। .... তারাই হলো আল্লাহ্র দল। জেনে রাখ, আল্লাহ্র দল অবশ্যই জয়যুক্ত হবে। (মুজাদিলা ঃ ২২)

এ আয়াতে দুটি বিষয় বলা হয়েছে। একটি নীতিগত কথা। অপরটি সত্য ঘটনার উল্লেখ।

নীতিগত কথাটি অতি সুস্পষ্ট। তা হচ্ছে এই যে, দ্বীনে হকের উপর ঈমান এবং দ্বীনে হকের বিরোধী বাতিলের প্রতি ভালোবাসা দুটি পরস্পর বিরোধী জিনিস। এ দুটির একত্রীকরণ কিছুতেই সম্ভব নয়। কোন ব্যক্তির পক্ষে যেমন এটা কিছুতেই সম্ভব নয় যে, সে আপন সত্তাকেও ভালোবাসবে এবং তার শত্রুকেও ভালোবাসবে, তেমনি এটাও সম্ভব নয় যে, ঈমান এবং ইসলামের দুশমনের প্রতি ভালোবাসা একই হৃদয়ে পোষণ করবে। যদি এমন দেখা যায় যে, কোন ব্যক্তি ঈমানের দাবী করার সাথে সাথে এমন সব লোকের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখে যারা ইসলামের দুশমন, তাহলে বুঝতে হবে তার ঈমানের দাবী মিথ্যা।

দ্বিতীয়ত ঃ এ আয়াতে উপরোক্ত মূলনীতি সুস্পষ্ট করে দেয়ার পর ঈমানের দাবীদারদের জন্য দৃষ্টান্ত স্বরূপ কিছু সত্য ঘটনার দিকে ইঙ্গি করা হয়েছে। এ এমন সুস্পষ্ট ঘটনা যা বদর এবং উহুদ যুদ্ধের সময় সমগ্র আরববাসী প্রত্যক্ষ করেছে।

যে সব সাহাবায়ে কিরাম মক্কা থেকে মদীনার শুধুমাত্র আল্লাহ এবং তাঁর দ্বীনে হকের জন্য হিজরত করেছিলেন, তাঁরা আপন গোত্র ও পরিবারস্থ লোকদের বিরুদ্ধেই অস্ত্র ধারণ করেছিলেন। কারণ তারা ছিল ইসলামের দুশমন।

হযরত আবু উবাইদাহ্ (রা) তাঁর পিতা আব্দুল্লাহ্ বিন জাররাহকে নিজ হাতে কতল করেন। হযরত মুসয়াব বিন উমাইর (রা) তাঁর আপন ভাই ওবায়েদ বিন উমাইরকে কতল করেন। যহরত ওমর (রা) তাঁর আপন মামা আস্-বিন-হিশাম বিন্ মুগিরাকে, হযরত আলী (রা) তাঁর নিকট আত্মীয় ওত্বাকে, হযরত হামযাহ্ (রা) তাঁর আ ীয় শায়বাকে এবং হযরত ওবাইদা বিন-হারেস তাঁর আত্মীয় অলিদ-বিন ওত্বাকে কতল করেন। হযরত আবু কবর (রা) তাঁর আপন পুত্র আবদুর রহমানকে কতল করতে উদ্যত হয়েছিলেন।

হযরত ওমর (রা) বদর যুদ্ধে বন্দীদের সম্পর্কে নবীর (স) কাছে আরজ পেশ করে বলেন, "এদেরকে কতল করা হোক এবং প্রত্যেকে তার আত্মীয়কে কতল করবে।"

বদর যুদ্ধের সময় হযরত মাস্‌য়াব বিন উমাইরের (রা) সহোদর ভাই আব্দুল আযীয বিন ওমাইরাকে জনৈক আনসার ধরে বেধে ফেলেছিলেন। হযরত মাসয়াব তা দেখে চিৎকার করে বললেন, "ওকে বেশ শক্ত করে বাঁধ। তার মা বড় মালদার। সে তোমাদের প্রচুর অর্থ দেবে ছেলের মুক্তির জন্য।

আব্দুল আযীয বললো, "তুমি ভাই হয়ে অমন কথা বললে?"

হযরত মাস্‌য়াব বললেন , "এখন আর তুমি আমার ভাই নও। যে আনসার তোমাকে বাঁধছে, সেই আমার ভাই।

এ যুদ্ধে নবী পাকের (স) জামাতা আবুল আস্‌ বন্দী অবস্থায় আনীত হলে, নবীর জামাতা বলে তার প্রতি কৃপা প্রদর্শন করা হয়নি। অন্যান্য বন্দীর মতোই তার সঙ্গে ব্যবহার করা হয়েছে। এভাবে সমগ্র বিশ্ব ভালোভাবে প্রত্যক্ষ করেছে সত্যিকার মু'মিন কেমন হয়ে থাকে এবং 'দ্বীনে হকের' সাথে তার সম্পর্ক কিরূপ।

কোন কোন দল বা জাতির সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক নিষিদ্ধ তা ভালো করে জেনে রাখা দরকার। নতুবা এ নিয়ে উভয় পক্ষে একটা ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হতে পারে। এ সম্পর্কে কুরআন মজিদে সুস্পষ্টরূপে ঘোষণা করা হয়েছে তা হলো ঃ

اِنَّمَا يَنْهٰكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ قَاتَلُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ وَاَخْرَجُوْكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوْا عَلٰى اِخْرَاجِكُمْ اَنْ تَوَلَّوْهُمْ ج وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ۔

(الممتحنة : ٩)

– যারা দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে এবং তোমাদেরকে তোমাদের আবাসভূমি থেকে বিতাড়িত করে দেয় অথবা বিতাড়নকারীকে সাহায্য করে, তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করতে আল্লাহ্‌ তোমাদেরকে নিষেধ করেছেন। এতদসত্ত্বেও যারা তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করবে, তারা জালেম।

(সূরা মুমতাহিনা ঃ ৯)

পক্ষান্তরে যাদের আচরণ উপরোক্ত আচরণের বিপরীত, তাদের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক এবং তাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন ও ইনসাফ করতে নিষেধ করা হয়নি।

لَا يَنْهٰكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ وَلَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْهُمْ وَتُقْسِطُوْا اِلَيْهِمْ ط اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ـ (الممتحنة ٨)

– "দ্বীনের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে না এবং যারা তোমাদেরকে তোমাদের আবাসভূমি থেকে বিতাড়িত করে দেয় না, তাদের সাথে ভালো ব্যবহার ও ইনসাফ করতে আল্লাহ্ তোমাদেরকে নিষেধ করেন না। নিশ্চয়ই ইনসাফকারীদেরকে আল্লাহ্ ভালোবাসেন।" (মুমতাহিনা ঃ ৮)

অর্থ-সম্পদের লিপ্সা না থাকাই ঈমানের দাবী

ঈমানের আর একটি দাবী হচ্ছে এই যে, ধন-সম্পদ অর্জনের মোহ অন্তরে পোষণ করা চলবে না। যাদের মধ্যে ধন-লিপ্সা থাকে, তারা দিনরাত এ চিন্তায় বিভোর থাকে। শেষ পর্যন্ত অবৈধ উপায়ে হলেও অর্থ-সম্পদ অর্জন করতে থাকে এবং লেনদেনে লিপ্ত হয়ে পড়ে। মানুষে মানুষে শত্রুতা দ্বন্দ্ব-কলহ, হত্যাকাণ্ড প্রভৃতি অর্থ লিপ্সারই বিষময় ফল। আল্লাহ্ বলেন ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوا الرِّبٰوا اَضْعَافًا مُّضٰعَفَةً ص ـ (ال عمران : ١٣٠)

–তোমরা যারা ঈমান এনেছো, চড়া সুদ ভক্ষণ করো না। (আলে ইমরান ঃ ১৩০)

কথাটি সুদ প্রসঙ্গে একটি নীতিগত ফরমান হলেও তা বলা হয়েছিল ওহুদ যুদ্ধের দীর্ঘ সমালোচনামূলক ভাষণে। কতিপয় সাহাবায়ে কিরামের আচরণ আল্লাহ্র মনঃপুত ছিল না এবং দ্বীনে হক প্রতিষ্ঠার উপযোগী ছিল না বলে কুরআন পাকে এ সবের তীব্র সমালোচনা করা হয়েছে। ওহুদ যুদ্ধের এক পর্যায়ে কতিপয় সাহাবী নবীর নির্দেশ অমান্য করে মালে গণিমত হস্তগত করতে লিপ্ত হয়েছিলেন। মানবীয় স্বাভাবিক দুর্বলতার কারণে কিছুক্ষণের জন্য তাঁদের মধ্যে ধন-লিপ্সা জাগ্রত হয়েছিল, যে দুর্বলতার সুযোগে খালেদ বিন ওয়ালিদের নেতৃত্বে কুরাইশ কাফিরগণ তাঁদের উপর প্রচণ্ড হামলা চালায়। যার ফলে সত্তর জন সাহাবী শহীদ হন।

আল্লাহ্র পথে নিঃস্বার্থভাবে এবং একমাত্র তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের মনোভাব নিয়েই অগ্রসর হতে হবে। ব্যক্তিগত ধন-লিপ্সা এ পথে বিরাট অন্তরায়।

ইসলামে ধন অর্জন নিষিদ্ধ নয় এবং দূষণীয়ও নয়। তা করতে হবে সদুপায়ে এবং ব্যয় করতে হবে আল্লাহ্র নির্দেশিত পথে। সাহাবায়ে কিরামও ধন-অর্জন করেছেন। কিন্তু দ্বীন প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনে তা সমুদয় দ্বিধাহীন চিত্তে ও সন্তুষ্টির সাথে আল্লাহ্র পথে বিলিয়ে দিয়েছেন। এর নজির বিহীন দৃষ্টান্ত দেখতে পাওয়া গেছে তাবুক অভিযানের প্রাক্কালে এবং যা ইসলামের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত আছে।

ধন-সম্পদ ঈমানের অগ্নি পরীক্ষা

ধন-সম্পদ মূলত কোন খারাপ বস্তু নয়। ধন-লিপ্সা এবং ধনকে আঁকড়ে ধরে থাকাটাই খারাপ। যেহেতু তা একটি পবিত্র আমানত, সে জন্য তার ব্যবহার হতে হবে আসল মালিক আল্লাহ্র মর্জি অনুযায়ী। তাই এ সম্পদ মানুষের বিরাট পরীক্ষা স্বরূপ।

আল্লাহ্ বলেন –

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُلْهِكُمْ اَمْوَالُكُمْ وَلَا اَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ

(المنفقون : ٩)

– হে ঈমানদারগণ! মনে রেখো তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তোমাদেরকে যেন আল্লাহ্ থেকে ভুলিয়ে না রাখে। (মুনাফিকুন ঃ ৯)

وَاعْلَمُوْا اَنَّمَا اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ لا وَاَنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗ اَجْرٌ عَظِيْمٌ

(الانفال : ٢٨)

– এবং জেনে রাখ যে, তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তানাদি তোমাদের জন্য পরীক্ষার জিনিস এবং আল্লাহ্র কাছে রয়েছে প্রতিদান দেবার বহু সামগ্রী।

(আনফাল ঃ ২৮)

মানুষের ঈমানের আন্তরিকতার মধ্যে যে জিনিস সাধারণত বিঘ্ন সৃষ্টি করে এবং যার কারণে তাদের মধ্যে মুনাফেকী, গাদ্দারি ও বিশ্বাসঘাতকতার রোগ প্রকাশ

পায়, তা হলো ধন-সম্পদ এবং সন্তানাদির প্রতি ভালোবাসা যখন তা সকল সীমা অতিক্রম করে। সে জন্য বলা হচ্ছে যে এ ধন-সম্পদ ও সন্তানাদি, যার প্রতি মোহবিষ্ট হয়ে মানুষ সাধারণত সত্য পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ে, প্রকৃত পক্ষে মানুষের জন্য বিরাট পরীক্ষা যাকে সে পুত্র অথবা কন্যা মনে করে সে হচ্ছে আসলে তার এক প্রকারের প্রশ্নপত্র।

অনুরূপভাবে ধন-দৌলত হলো দ্বিতীয় প্রশ্নপত্র। এ সব এ জন্য মানুষকে দেয়া হয় যে, এতসব লাভ করার পর সে সত্য পথে চলতে পারে কিনা এ সবের ভালোবাসা ও লোভলালসা থেকে তার মনকে পবিত্র ও অমলিন রাখতে পারে কিনা এবং আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখারেখার মধ্যে তাদের প্রতি ব্যবহার করতে পারে কিনা তার প্রমাণ তাকে দিতে হবে।

এইটাই হলো ঈমানের দাবী।

ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিকে মানুষের জন্য বিরাট পরীক্ষা এবং আল্লাহ্‌র মর্জি পূরণের জন্য এ সব বিসর্জন দেয়াকেই এ পরীক্ষায় সাফল্য বলা হয়েছে।

দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পার্থিব কল্যাণ

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, এত সব ত্যাগ ও বিসর্জন আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ও দ্বীন প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে। এ দ্বীনকে প্রতিষ্ঠার কাজটা যে শুধু পরকালের জন্য মঙ্গলজনক তা নয়, বরঞ্চ আল্লাহ্‌র বন্দেগী ও আনুগত্যের ভিত্তিতে যে সমাজ, যে তাহ্‌যিব ও তামাদ্দুন গঠিত হবে, সেখানে বিরাজ করবে পরিপূর্ণ ইনসাফ এবং জান ও মালের পূর্ণ নিরাপত্তা।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেন –

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوَّامِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ ـ (النساء : ١٣٥)

– হে ঈমানদারগণ! তোমাদের কাজ হলো এই যে, তোমরা ইনসাফ ও ন্যায় নীতির ধ্বজাবাহী এবং আল্লাহর জন্য সাক্ষ্যদাতা হয়ে যাও। (নিসা ঃ ১৩৫)

কথা এখানে এতটুকু বলা হয়নি যে, "তোমরা ইনসাফ কায়েম কর।" বরঞ্চ বলা হয়েছে যে, "ইনসাফ ও ন্যায়-নীতির ধ্বজাবাহী হয়ে যায়। তার অর্থ হলো মু'মিনদের কাজ শুধু ইনসাফ কায়েম করাই নয়, ইনসাফের পকাতাবাহী তাদেরকে হতে হবে। তাদেরকে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে এক বিশ্বব্যাপী আন্দোলনে যাতে করে নিপীড়িত মানব সমাজ থেকে জুলুম, অত্যাচার, অন্যায়, অনাচার ও বে-ইনসাফীর মূলোৎপাটন হয় এবং তার জায়গায় প্রতিষ্ঠিত হয় সুখ-শান্তি, সম্প্রীতি, নিরাপত্তা ও পূর্ণ সুবিচার।

অতঃপর এ মহৎ কাজের সাক্ষ্য দিতে হবে একমাত্র আল্লাহ্ তায়ালার নিকটে। ব্যক্তিগত বা দলীয় কোন স্বার্থে অথবা মানুষের প্রশংসা লাভের উদ্দেশ্যে যেন এ কাজ করা না হয়, তার জন্য শতর্ক বাণী রয়েছে এ আয়াতে।

বিপদে পৃষ্ঠ প্রদর্শন ঈমানের পরিপন্থী

দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজে যে নানারূপ বিপদের, ঝড়-ঝঞ্ঝার সম্মুখীন হতে হবে তা এক অবধারিত সত্য। এ বিপদের ঘণ্টাধ্বনী শ্রবণ করে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করা যে ঈমানের পরিপন্থী সে সম্পর্কে কুরআন বলে –

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَنْ يَّرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهٖ فَسَوْفَ يَاْتِى اللّٰهُ بِقَوْمٍ يُّحِبُّهُمْ وَيُحِبُّوْنَهٗ لا اَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اَعِزَّةٍ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ز يُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا يَخَافُوْنَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ط (المائدة : ٥٤)

– হে মু'মিনগণ! ভালো করে জেনে রেখে দাও যে, তোমাদের মধ্যে যদি কেউ দ্বীন থেকে সরে পড়ে, তো পড়ুক। এরপরও আল্লাহ্ এমন বহু লোক পয়দা করবেন যারা হবে আল্লাহ্‌র প্রিয় এবং আল্লাহ্ও তাদের প্রিয় হবেন। আর যারা মু'মিনদের প্রতি হবে উদার ও কোমল এবং কাফেরদের প্রতি হবে কঠোর এবং যারা আল্লাহ্‌র পথে চরম প্রচেষ্টা চালাবে। এ ব্যাপারে তারা কারো তিরস্কার, ভর্ৎসনার কোন পরোয়াই করবে না। (মায়েদাহ্ ঃ ৫৪)

দ্বীন থেকে সরে পড়ার পর ঈমানের আর কোনো প্রশ্নই থাকে না। এখন এই ঈমানহীন লোকের পরিবর্তে আল্লাহ্ যাদেরকে ময়দানে নিয়ে আসেন, তারা আলবৎ ঈমানদার। আল্লাহ্‌র সঙ্গে গড়ে ওঠে তাদের ভালোবাসার সম্পর্ক। তারা আল্লাহ্‌র প্রিয় হয় এবং আল্লাহ্ হন তাদের প্রিয়। এখন মু'মিনের পরিচয় হলো এই যে তারা মু'মিনদের প্রতি হবে কোমল এবং কাফেরদের প্রতি কঠোর।

'মু'মিনদের প্রতি কোমল' কথার অর্থ এই যে, একজন মু'মিন অন্য কোন মু'মিনের বিরুদ্ধে কিছুতেই আপন শক্তি প্রযোগ করবে না। তার প্রতিভা, বুদ্ধিমত্তা, বিচক্ষণতা, যোগ্যতা, প্রভাব প্রতিপত্তি, ধন-সম্পদ, দৈহিক শক্তি প্রভৃতি কোন কিছুই

মুসলমানদেরকে দমিত, উত্যক্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত করার কাজে ব্যবহৃত হবে না। মুসলমান সমাজ তাকে সর্বদা একজন কোমল প্রাণ, দয়ালু, সহানুভূতিশীল ও ধৈর্যশীল লোক হিসেবে দেখতে পাবে।

'কাফিরদের প্রতি কঠোর' কথাটির তাৎপর্য এই যে, একজন মু'মিন ঈমানের পরিপক্কতা, একনিষ্ঠ দ্বীনদারী, আদর্শের প্রতি দৃঢ়তা, চরিত্রের অদম্য শক্তি প্রভৃতি গুণাবলীর কারণে ইসলামের শত্রুর মোকাবিলায় হবে ইস্পাত কঠিন, যাতে করে তাকে তার আপন স্থান থেকে কিছুতেই বিচ্যুত করা না যায়। সে না কারো ভয়ে-শংকিত হবে, না কারো কথায় বিগলিত হবে। প্রতিপক্ষের সম্মুখীন হলে সে জীবন দিবে। কিন্তু কোনো মূল্যেই নতি স্বীকার করবে না অথবা প্রভাবিত হবে না।

ঈমানের পরিচয়ে আরও বলা হয়েছে যে, সে আল্লাহ্‌র দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য বিরামহীন সংগ্রাম করে যাবে। তার জন্য সে কারো তিরস্কার বিদ্রুপের কোন পরোয়া করবে না। না তার চলার গতিকে সে কখনো মন্দিভূত করবে।

এখন কথাটি অধিকতর সুস্পষ্ট হয়ে গেল যে, ঈমানের সবচেয়ে বড়ো পরিচয় হলো এই যে, আল্লাহ্‌র দ্বীনকে মানব সমাজে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য বিরামহীন সংগ্রাম করে যাওয়া এবং এর ফলে একজন মু'মিন যেমন আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দাহ্ হয়ে পড়বে, তেমনি আল্লাহ্‌ও তার কাছে হবেন সবচেয়ে প্রিয়।

বলা বাহুল্য এ সংগ্রামের ভেতর দিয়েই ঈমানের সত্যিকার পরীক্ষা হয়। এভাবে পরীক্ষার দ্বারা আল্লাহ্ তায়ালা প্রকৃত মু'মিনদেরকেই বেছে আলাদা করে নেন এবং তাদেরই দ্বারা কাফিরদেরকে পরাভূত করেন। (আলে ইমরান ঃ ১৪২)

এ সংগ্রাম ব্যতীত না ঈমানের কোন সাক্ষ্য দান করা সম্ভব হবে, আর না পরজীবনে বেহেশত লাভ করা যাবে। আল্লাহ্ বলেন–

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ جٰهَدُوْا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصّٰبِرِيْنَ - (ال عمران : ١٤٢)

(তোমরা কি বেহেশতে যাওয়ার আশা পোষণ করে বসে আছ, যতোক্ষণ না আল্লাহ্ জানতে পারলেন যে, দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্‌র পথে

সংগ্রাম কারা করলো এবং যতোক্ষণ না আল্লাহ্ এ কথাও জানতে পারলেন যে, কারা অবিরাম ধৈর্য সহকারে এ পথে চললো। (আলে-ইমরান ঃ ১৪২)

ঈমানের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে যারা দ্বীনের পথে চলা শুরু করেছেন, যে পথের গন্তব্যস্থান হলো দ্বীনে হকের প্রতিষ্ঠা ও আল্লাহ্র সন্তুষ্টি, তাঁদেরকে যে প্রতি পদে পদে চরম বাধার সম্মুখীন হতে হবে, তা আগের আলোচনায় সুস্পষ্ট হয়েছে এবং ইসলামের অতীত ইতিহাসও তার সাক্ষ্য বহন করছে। এখন এ পথে যাঁরা চলেন, তাঁদের মধ্যে একজন সাধারণ মু'মিন অথবা দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের কোন কর্মী বা নেতা যদি জীবন ও ধন-সম্পদ বিপন্ন হওয়ার আশংকায় বাতিলের কাছে নতি স্বীকার করে, দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলন পরিত্যাগ করে বাতিলের সাথে সহযোগিতার আকুল আগ্রহ দেখান, তাহলে ঈমানের গণ্ডি থেকে তিনি বেরিয়ে যাবেন এবং এমন ব্যক্তিকে মুনাফিক ছাড়া আর কিছু বলা যাবে না।

দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলন যাঁরা করেন, তাঁদের এ বিষয়ে অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। তাঁদের প্রত্যেকের এমন প্রশিক্ষণ হওয়া বাঞ্ছনীয় এবং এ প্রশিক্ষণ অগ্নি পরীক্ষার ভেতর দিয়ে অবশ্যই হতে হবে, যাতে করে কোন চরম মুহূর্তে দ্বীন প্রতিষ্ঠা আন্দোলনের কোন কর্মী জীবন ও ধন-সম্পদের নিরাপত্তার জন্য অথবা সন্তান-সন্তুতির সুখ স্বাচ্ছন্দের জন্য বাতিলে কাছে আত্মসমর্পণ না করে। এ আন্দোলনের নেতৃত্ব যিনি দিবেন, তাঁকে হতে হবে অধিকতর উন্নত চরিত্রের অধিকারী। আপন জীবন, ধন-সম্পদ, স্ত্রী-পুত্র পরিজন সব কিছুকেই আল্লাহ্র পথে উৎসর্গ করার মনোবল ও সাহস যাঁর আছে এবং বিভিন্ন সময়ে এ ধরনের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার নজির যিনি পেশ করেছেন, তিনিই দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলন পরিচালনার নেতৃত্ব দিতে পারেন। যদি দুর্বল চরিত্রের লোক নেতৃত্বের আসনে সমাসীন হয়, তাহলে যে কোন চরম মুহূর্তে গোটা আন্দোলনকে নিয়ে সে নিমজ্জিত হবে এবং রেখে যাবে এক কলংকের ইতিহাস।

আশার করি এরপর বিষয়টি বুঝতে মোটেই কষ্ট হবার কথা নয়। এমনিভাবে যদি আমরা সমগ্র কুরআন পাক আলোচনা করি তাহলে জানতে পারব যে, ঈমানের

দাবী শুধু ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের প্রতিষ্ঠাই নয়। ঈমাদের দাবী অনুযায়ী এ হলো কাজের সূচনা মাত্র। দরজা, জানালা ও ছাদসহ অট্টালিকা নির্মাণ হলেই এ কাজের সমাপ্তি বুঝতে হবে। অনুরূপভাবে ইসলামের প্রাসাদ নির্মাণের জন্য তার সূচনা হলো পাঁচ স্তম্ভের নির্মাণ বা প্রতিষ্ঠা। এ স্তম্ভের উপরে গোটা প্রাসাদ নির্মাণ করাই ঈমানের পরবর্তী দাবী। সে সব দাবী একটি একটি করে কুরআনে বলা হয়েছে। আর এসব দাবী পরিপূর্ণরূপে পালন করেছেন আল্লাহ্‌র শেষ নবী (স) ও তাঁর প্রিয় সাহাবায়ে কিরাম (রা)। তাই ঈমানের দাবী পরিপূর্ণরূপে পালন করতে হলে একদিকে যেমন কালামে পাক গভীর মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করতে হবে, অপরদিকে নবী ও সাহাবায়ে কিরামের পবিত্র জীবনকেও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসরণ করতে হবে।

ঈমান প্রসঙ্গে হাদীসে রসূল

এখন নবীর হাদীস থেকে ঈমানের দাবী সম্পর্কে কয়েকটি দৃষ্টান্ত পেশ করে আলোচনা করতে চাই।

اَلْاِيْمَانُ بِضْعٌ وَّسَبْعُوْنَ شُعْبَةً فَاَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَدْنٰهَا اِمَاطَةُ الْاَذٰى عَنِ الطَّرِيْقِ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْاِيْمَانِ ـ

– ঈমানের বহু শাখা প্রশাখা আছে। তার মধ্যে সর্বোত্তম এই যে, তুমি আল্লাহ্ ব্যতীত আর কাউকে তোমার শাসক বা প্রভু স্বীকার করবে না। ঈমানের নিম্নতম গুরুত্বপূর্ণ শাখা হলো এই যে, রাস্তায় পথিকের কষ্টদায়ক কোন কন্টক পড়ে থাকতে দেখেলে তা সরিয়ে ফেলবে। লজ্জাশীলতাও ঈমানের একটি শাখা।

এর থেকে বুঝা গেল যে, ঈমানের ন্যূনতম দাবী হলো মানুষের সকল প্রকার দুঃখ-কষ্ট দূর করার চেষ্টা করা। লজ্জাশীলতাও ঈমানের একটি দাবী।

اَلْمُؤْمِنُ مَنْ اَمِنَهُ النَّاس عَلٰى دِمَائِهِمْ وَاَمْوَالِهِمْ ـ

মু'মিন ঐ ব্যক্তি, যার দ্বারা কারো জানমালের আশংকা হয় না।

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهٗ ... فَلَا يُؤْذِ جَارَهٗ .... فَلْيَقُلْ خَيْرًا اَوْ لِيَصْمت ـ

– যে খোদা ও পরকালের উপর বিশ্বাস রাখে, তার উচিত মেহমানের সমাদর করা, ... প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়া .... ভালো কথা বলা।

وَاللّٰهِ لَا يُؤْمِنُ وَاللّٰهِ لَا يُؤْمِنُ وَاللّٰهِ لَا يُؤْمِنُ الَّذِىْ لَا يَاْ مَنُ جَارُهٗ بَوَائِقَهٗ ـ

– খোদার কসম ঐ ব্যক্তি মু'মিন নয়, খোদার কসম ঐ ব্যক্তি মু'মিন নয়, খোদার কসম ঐ ব্যক্তি মু'মিন নয়, যার দৌরাত্মে প্রতিবেশী শান্তিতে বসবাস করতে না পারে।

لَيْسَ الْمُؤْمِنُ الَّذِىْ يَشْبَعُ وَجَارُهٗ جَائِعٌ اِلٰى جَنْبِهٖ ـ

– যে ব্যক্তি পরিতৃপ্ত হয়ে আহার করে এবং তার প্রতিবেশী ক্ষুধার্ত থাকে, সে ঈমানদার হতে পারে না।

لَا اِيْمَانَ لِمَنْ لَا اَمَانَةَ لَهٗ وَلَا دِيْنَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهٗ ـ

– যার মধ্যে আমানতদারী নেই, তার ঈমান নেই এবং যে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে সে বে-দ্বীন।

اِذَا سَرَّتْكَ حَسَنَتُكَ وَسَاءَتْكَ سَيِّئَاتُكَ فَاَنْتَ مُؤْمِنٌ ـ

– যদি নেক কাজে তোমার আত্মতৃপ্তি এবং পাপ কাজে অনুশোচনা হয়, তাহলে তুমি একজন ঈমানদার।

اَفْضَلُ الْاِيْمَانِ اَنْ تُحِبَّ لِلّٰهِ وَتُبْغِضَ لِلّٰهِ وَتَعْمَلَ لِسَانَكَ فِى اللّٰهِ وَاَنْ تُحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ النَّفْسَكَ وَتَكْرَهُ لَهُمْ مَا تَكْرَهُ لِنَفْسِكَ ـ

– সর্বোৎকৃষ্ট ঈমানের পরিচয় এই যে, তোমার বন্ধুত্ব এবং শত্রুতা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের জন্য হবে। তোমার মুখে আল্লাহ্‌র যিকর জারী থাকবে। নিজের জন্য যা পছন্দ করবে অপরের জন্যও তাই করবে এবং নিজের জন্য যা অপছন্দনীয় মনে করবে, অপরের জন্যও তাই করবে।

اَلطُّهُوْرُ شَطْرُ الْاِيْمَانِ ـ

– শরীর ও পোশাকের পবিত্রতা ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ঈমানের অর্ধেক।

اَكْمَلُ الْمُؤْمِنِيْنَ اِيْمَانًا اَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَالطفهم بِاَهْلِهِ ـ

তোমাদের মধ্যে পরিপূর্ণ ঈমানদার ঐ ব্যক্তি যার চরিত্র সবচেয়ে ভালো এবং যে আপন পরিবারবর্গের সাথে সকলের চেয়ে ভালো ব্যবহার করে।

لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَانِ وَلاَ بِاللَّعَانِ وَلاَ الْفَاحِشِ وَلاَ الْبَذِى ـ

– মু'মিন ব্যক্তি কখনো বিদ্রূপকারী, অভিসম্পাৎকারী অশ্লীলভাষী এবং প্রলাভকারী হতে পারে না।

يُطْبَعُ الْمُؤْمِنُ عَلَى الْخِصَالِ كُلِّهَا اِلاَّ الْخِيَانَةَ وَالْكِذْبِ

একজন মু'মিন সবকিছু হতে পারে। কিন্তু আত্মসাৎকারী ও মিথ্যাবাদী হতে পারে না।

مَنْ كَظِمَ غَيْضًا وَيَقْدُرُ عَلَى اَنْ يَنْفُذَهُ ملا اللّٰهُ قَلْبَهُ اَمْنًا وَاِيْمَانًا ـ

ক্রোধাগ্নি প্রজ্বলিত হবার পর যদি কেউ তা নির্বাপিত করে, খোদা তার অন্তর ঈমান এবং আত্মতৃপ্তি দ্বারা পরিপূর্ণ করে দেন।

مَنْ مَشٰى مَ ظَالِمٍ لِيَقْوِيْهِ وَهُوَ يَعْلَمُ اَنَّهُ ظَالِمٌ فَقَدْ خَرَجَ مِنَ الْاِسْلَامِ ـ

জ্ঞাতসারে যে ব্যক্তি কোন জালেমের সহযোগিতা করে সে ইসলাম থেকে বেরিয়ে যায়।

অত্যাচারী জালিমের সহযোগিতা করাকে এখানে ঈমানের পরিপন্থী বলা হয়েছে। জালিমের সহযোগিতা না করাই ঈমানের অন্যতম দাবী নয়, বরঞ্চ জালিমের জুলুমের প্রতিরোধ করা, তার বিরুদ্ধে আওয়াজ বুলন্দ করাও ঈমানের দাবী।

ঈমানের দাবী কি তা উপরের আলোচনায় সুস্পষ্ট হয়েছে বলে মনে করি। এখন ঈমানের দাবীসমূহ পূরণের সহজ পন্থা কি?

অবশ্যি ঈমানের দাবী পূরণ করা কাজটি মোটেই সহজ নয়। বরঞ্চ তা অত্যন্ত কঠিন। তবে একজন মু'মিন যখন ঈমানের দাবী পূরণের জন্য দৃঢ় সংকল্প হয় এবং

তার জন্য সকল প্রকার ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত হয়, তখন তার কিছু পন্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন হয়। এ জন্য আমাদেরকে আবার পূর্বের কথায় ফিরে যেতে হবে। অর্থাৎ শেষ নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (স) কোন পন্থায় সাহাবায়ে কিরামের চরিত্র গঠন করলেন যার দ্বারা তাঁরা ঈমানের প্রতিটি দাবী পূরণ করতে পেরেছিলেন। মনে রাখতে হবে যে, ঈমান আনার সাথে সাথেই তাঁদের ঈমানের সব দাবী পূরণ হয়ে যায়নি। এ ব্যাপারে তাদের কার্যক্রম ছিল নিম্নরূপ ঃ

প্রথমত, ঈমান আনার সাথে সাথে তাঁরা জাহিলিয়াত তথা ইসলাম বিরোধী আকীদাহ্ বিশ্বাস, মতবাদ, দর্শন ও চিন্তাধারা এবং একাধিক খোদার বন্দেগী আনুগত্যের বিরুদ্ধে সোচ্চার হলেন। ফলে তাদের উপরে নেমে এলো অত্যাচার নিষ্পেষণ।

দ্বিতীয় পর্যায়ে তাঁরা যে সমস্যার সম্মুখীন হলেন তা হলো একদিকে ঈমানের দাবী অন্যদিকে জাহেলিয়াতের দাবী। জাহেলিয়াত জুলুম নিষ্পেষণে মাধ্যমে এ দাবী তুলে ধরলো যে ঈমান পরিত্যাগ করলেই জুলুম নিষ্পেষণ বন্ধ হবে, তাদের জীবন আবার পূর্বের মতন সুখী ও সুন্দর হবে। অর্থনৈতিক ও জান-মালের নিরাপত্তা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে।

পক্ষান্তরে ঈমানের দাবী ছিল, ঈমানের উপরে মজবুত ও অচল অটল হয়ে থাকা, পরিণাম তার যা কিছুই হোক না কেন? স্বয়ং নবী পাক (স)-এর এবং সাহাবীদের জীবনে আমরা তাই দেখেছি। জীবনের পদে পদে ঈমান ও জাহেলিয়াতের দুই বিপরীতমুখী দাবীর সম্মুখীন তাঁরা হয়েছেন। ঈমানের দাবীতে যারা অটল রয়েছেন, তাঁরাই অগ্নি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ঈমানের দাবী পূর্ণ করেছেন। কতিপয় ব্যক্তি এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে না পেরে মুনাফিক নামে অভিহিত হয়েছেন।

গভীরভাবে চিন্তা করার বিষয়

উপরের আলোচনায় এ কথা পরিষ্কার হয়েছে যে, ঈমানের দাবী হচ্ছে তার উপর অবিচল অটল হয়ে জীবনের সর্বক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র একান্ত অনুগত বা সত্যিকার মুসলমান হিসেবে জীবন যাপন করা। এ শুধু এক ব্যক্তির জন্য নয়, বরঞ্চ যারাই ইসলামের কালেমার প্রতি জেনে বুঝে ঈমান এনে মুসলমান হয়েছে তাদের সকলকে সম্মিলিতভাবে মুসলমানের মতো জীবন যাপন করতে হবে। একাকী কারো পক্ষে জীবনের সকল ক্ষেত্রে মুসলমান হয়ে চলা কিছুতেই সম্ভব নয়। তার জন্য একটা পরিপূর্ণ ইসলামী পরিবেশ ও সমাজ ব্যবস্থার একান্ত প্রয়োজন। গোটা সমাজের উপরে অর্থাৎ অর্থনীতি, রাজনীতি, শাসন, বিচার ব্যবস্থা, শিক্ষা-দীক্ষা, সংস্কৃতি ও শিল্পকলা, ব্যবসা-বাণিজ্য, লেনদেন, বন্ধুত্ব-শত্রুতা, যুদ্ধ ও সন্ধি মোট কথা জীবনের সকল ক্ষেত্রের উপর ইসলামের পরিপূর্ণ কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ রাখতে হবে।

একটা অনৈসলামী পরিবেশ অথবা কুফরী শাসনের অধীনে কোন মুসলমানই তার ঈমানের দাবী পুরোপুরি পালন করতে পারে না। হয় সে ঈমানের কোন দাবীই পালন করতে পারবে না, যেমন কোন কমিউনিস্ট শাসনে এ দাবী পালন করা মোটেই সম্ভব নয়, অথবা কোন কুফরী রাষ্ট্রে যতোটুকু ঈমাদের দাবী পূরণ করার অনুমতি দেবে তার অধিক পালন করাও যাবে না। অথচ আল্লাহ্ বলেন –

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱدْخُلُوا۟ فِى ٱلسِّلْمِ كَآفَّةً ص وَلَا تَتَّبِعُوا۟ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيْطَٰنِ ط إِنَّهُۥ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ (البقرة : ٢٠٨)

– হে ঈমানদারগণ ! তোমাদের সমগ্র জীবনকে ইসলামের অধীন করে দাও এবং (জীবনের কোন অংশকে ইসলামের বাইরে রেখে) শয়তানের আনুগত্য করো না। (কারণ) সে তোমাদের সুস্পষ্ট দুশমন। (বাকারাহ ঃ ২০৮)

মানব জীবন অবিভাজ্য। কিন্তু কেউ যদি কৃত্রিমভাবে জীবনকে বহু ভাগে বিভক্ত করে কোন কোনটিকে ইসলামের নির্দেশ অনুযায়ী পরিচালিত করে এবং বাকীগুলো ইসলাম বহির্ভুত করে রাখে তাহলে তাকে পূর্ণ মুসলমান বলা যাবে না। জীবনের এসব ক্ষেত্রে তাকে আল্লাহ ব্যতীত অপরের আনুগত্য করতে হবে। এটাকেই শয়তানের বা খোদা বিরোধী শক্তির আনুগত্য বলা হয়েছে।

আল্লাহ্ বলেন –

وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهٖ اَحَدًا ۔ (كهف : ١١٠)

– এবং সে (মুসলমান) যেন আনুগত্য করার ব্যাপারে আপন প্রভুর (আল্লাহ্‌র) সাথে আর কাউকে অংশীদার না করে। – (কাহাফ ঃ ১১০)

তাহলে জীবনের যে যে ক্ষেত্রে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন মতবাদ বা আদর্শের অনুসরণ করা হবে, তা হবে আল্লাহ্‌র সাথে অন্যকে শরীক করারই নামান্তর। মসজিদে আল্লাহ্ তায়ালার আনুগত্য করা হবে এবং মসজিদের বাইরে জীবনের বৃহত্তর ক্ষেত্রে, রাজনীতি, অর্থনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিক্ষা-সংস্কৃতি, কোর্ট-কাচারী, আদালত-ফৌজদারী, কৃষিক্ষেত্রে ও কলকারখানায় আল্লাহ্‌র পরিবর্তে আনুতগ্য করা হবে অন্যের – একে বলা হবে পূর্ণ মুনাফিকী – ইসলামী জীবন পদ্ধতি কিছুতেই বলা যাবে না। সমগ্র জীবনকে আল্লাহ্‌র আনুগত্যে সপর্দ করার নামই ত ইসলাম। ঈমানের দাবীও ত তাই। তাহলে চিন্তা করুন একজন মুসলমান কখন এবং কিভাবে সত্যিকার মুসলমান হতে পারে।

কুফরী শাসন ব্যবস্থার অধীনে একজন মুসলমান মুসলমানী জীবন যাপন করতেই পারে না। যে দেশ, ভূখণ্ড বা জনপদে আল্লাহ্‌র শাসন কর্তৃত্বের পরিবর্তে মানুষের শাসন কর্তৃত্ব চলে, গোটা সমাজ ও সামাজিক পরিবেশ খোদাদ্রোহিতায় নিমজ্জিত থাকে, দুর্নীতি, সুদ-ঘুষ, ব্যভিচার, মদ্যপান, নারী-পুরুষের অবাধ

মেলামেশা, সংস্কৃতির নামে নারী পুরুষের একত্র সমাবেশ, অশ্লীল নাচ-গান, জুয়া, চরিত্র ধ্বংসকারী ছায়াছবি প্রভৃতি যে সমাজের নিত্যনৈমত্তিক কর্মকাণ্ড সেখানে একজন মুসলমান কি করে তার ঈমান বাঁচিয়ে রাখতে পারে।

এ সব যে শুধু অমুসলিম বা কাফির রাষ্ট্রেই চলছে তা নয়, বরঞ্চ ব্যাপক আকারে চলছে মুসলিম দেশগুলোতে ও মুসলিম সমাজে। যারা জীবনের অতি সংকীর্ণ পরিসরে নামায-রোযা ও কিছু যিকির আযকারকে শেষ সম্বল হিসেবে আঁকড়ে ধরে পরকালীন জীবনে পরিত্রাণ লাভের আশায় বুক বেঁধে আছেন, তাঁদের আপন সন্তান-সন্তুতি ইসলামের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে ইসলাম বিরোধী মতবাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ছে। তাদের এ চরিত্র ও আচার-আচারণে ইসলামের কোন নাম নিশানা খুঁজে পাওয়া যায় না। শক্তিশালী ইসলাম বিরোধী শিক্ষা ব্যবস্থা ও পরিবেশ যুব সমাজকে ইসলামের বিরুদ্ধে সংগ্রামী মনোভাব পোষণ করতে বাধ্য করছে। এ সবের কারণ এই যে, মুসলমান একটা মিল্লাত হিসেবে ইসলাম থেকে দূরে সরে যাওয়ার ফলে এবং তাদের মধ্যে আল্লাহ্‌র পথে আত্মত্যাগ ও জিহাদী প্রেরণার পরিবর্তে পার্থিব ভোগ-বিলাসের লিপ্সা জাগ্রত হওয়ার ফলে তারা শৃগালের জাতিতে পরিণত হয়। দীর্ঘকাল ধরে গোলামির জীবন যাপন তাদেরকে ইসলামের প্রতি সন্দিহান করে তোলে। তাদের চিন্তাধারা, মনমানসিকতা, জীবনের মূল্যবোধ , সত্য-অসত্য ও ভালো-মন্দের মানদণ্ড পরিবর্তন হয়ে যায়। মুসলমান হয়েও বিধর্মী প্রভুর মন দিয়ে চিন্তা করা শুরু করে, তাদের চোখ দিয়ে দেখতে থাকে, তাদের রঙে নিজেদের রঞ্জিত করে।

কয়েক'শ বছরের গোলামীর পর স্বাধীনতা লাভ করলেও তারা মানসিক গোলামী পরিত্যাগ করতে পারেনি, এর অনিবার্য পরিণাম দুনিয়ার জীবনেও অশেষ লাঞ্ছনা। আজ সমগ্র মুসলিম বিশ্বের অবস্থা এই একই রকমের। আল্লাহকে একমাত্র ইলাহ, অলি ও অভিভাবক মনে করে তাঁরই উপরে নির্ভরশীল না হয়ে তারা ইসলামের দুশমন, বাতিল শক্তির দয়ার উপর নির্ভর হয়ে পড়েছে। তার ফলে শেষ নবী (স) কর্তৃক নির্মিত ইসলামের প্রাসাদে আগুন জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছে। আর সে আগুনে পুড়ে মরছে মুসলমান, ফিলিস্তিন ও লেবাননের মুসলমান, মিশর, লিবিয়া ও আলজেরিয়ার মুসলমান ও ইরাকের মুসলমান। এ আগুনে দাউ দাউ করে জ্বলে

মরছে আফগানিস্তানের মুসলমান। অন্যান্য দেশের মুসলমানদের অবস্থাও প্রায় একই রকমের। আজ মুসলমান মুসলমানকে নির্মমভাবে হত্যা করছে। মুসলমান হয়ে ইসলামের ঘরে আগুন জ্বালাচ্ছে। মুসলিম যুব সমাজ আজ ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধাংদেহি মনোভাব পোষণ করছে। ভবিষ্যৎ বংশধরদেরকে ইসলাম বিরোধী শক্তি হিসেবে গড়ে তোলার সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্র চলছে। সাহিত্য, সংস্কৃতি, নাচ-গান, পর্ণগ্রাফ ও অশ্লীল ছায়াছবির মাধ্যমে এ ষড়যন্ত্র অবিরাম চলছে।

এ হচ্ছে মুসলিম সমাজের বেদনাদায়ক চিত্রের একটি দিক। অপর অধিকতর বেদনাদায়ক চিত্র এই যে, আপন ঘরে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠা আগুনের লেলিহান শিখা দেখেও আমাদের মনে কোন দুশ্চিন্তার কালোমেঘ জমাট বাঁধে না। আমরা সব কিছু থেকে চক্ষু বন্ধ করে আমাদের দৈনন্দিন কাজকর্মে মশগুল আছি। ধর্মের গতানুগতিক প্রাণহীন অনুষ্ঠানাদি নিয়ে পড়ে আছি। খানকা, মাদ্রাসা, যিকির-আযকার, কালেমা শিখানোর অর্থহীন মহড়া নিয়ে ব্যস্ত আছি। নবী মুস্তাফার (স) নির্মিত প্রাসাদে আগুন জ্বলছে, তা নিভানোর কোন চিন্তা ও চেষ্টা না করে তাঁর উপরে শুধু দরুদ ও সালাম পাঠ করছি। একে নবী প্রেমের পরিচয় বলা যায় না, নবীর সাথে তাঁর প্রতিষ্ঠিত আদর্শের সাথে চরম বিশ্বাসঘাতকতাই বলতে হবে।

বাঁচবার উপায় কি?

বাঁচতে হলে তার একটি মাত্র পথ হচ্ছে এই যে, ঈমানের ভিত্তিতে আমরা আমাদের মুসলমান নামে অভিহিত করি সে ঈমানের দাবী পূরণ করতে হবে। ঈমানের দাবী কি তার বিশদ আলোচনা উপরে করা হয়েছে। এখন ঈমানের দাবী পূরণ করতে হলে নিম্নের কর্মসূচি মনে প্রাণে গ্রহণ করে তা কার্যকর করার আপ্রাণ চেষ্টা করতে হবে।

এক. আমাদের প্রত্যেককে আল্লাহর কুরআন ও তাঁর শেষ নবীর সুন্নাহ্র স্মরণাপন্ন হতে হবে। কুরআন ও সুন্নাহ থেকে নবী পাকের ও সাহাবায়ে কিরামের সীরাত থেকে ইসলামের প্রকৃত রূপ ও আকৃতি জেনে নিতে হবে। মুসলমানের পতনযুগে বাইরের চিন্তাধারা ও ভ্রান্ত দর্শন ইসলামের গায়ে জাহেলিয়াত ও বিদআতের যে রঙ লাগিয়ে দিয়েছে তার থেকে ইসলামকে পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। আল-কুরআন যে ইসলাম পেশ করেছে, নবী পাক (স) যে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত করেছেন, সেটাকে ভালো করে জেনে নিতে হবে।

দুই. আমাদের প্রত্যেককে ইসলামের মুবাল্লিগ হতে হবে। সত্যিকার ইসলাম মানুষের সামনে তুলে ধরতে হবে। সকল স্তরের মুসলমানের কাছে, বিশেষ করে যুব সমাজের কাছে ইসলামের মহান শিক্ষাকে তুলে ধরতে হবে। এটা সফল হবে তখন, যখন প্রত্যেক মুবাল্লিগ তার ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনে ইসলামের মূর্ত প্রতীক হবে।

এ উদ্দেশ্যে সাধারণ ওয়ায মাহফিল থেকে বেশি ফলপ্রসূ পন্থা হচ্ছে কুরআনের নির্ভরযোগ্য তাফসীর, হাদীস ও বিভিন্ন ইসলামী সাহিত্যের ব্যাপক প্রচার, ব্যক্তিগত

সাক্ষাতের মাধ্যমে আলাপ-আলোচনা প্রভৃতি। ইসলাম বিভিন্ন দিকের উপরে যুব সমাজের উপযোগী করে সাহিত্য রচনা ও তার প্রচার ও প্রসার।

তিন. ইসলামী শিক্ষার সাথে শিক্ষার্থীদেরকে সংগঠিত করা এবং তাদেরকে ইসলামের বাস্তব প্রশিক্ষণ দিয়ে বাতিল মতবাদ ও চিন্তাধারার মুকাবিলা করার যোগ্য করে গড়ে তোলা এবং সকলে মিলে জামায়াত বদ্ধ হওয়া।

যতোদিন না এ ধরনের পরিপূর্ণ ইসলামী জ্ঞান ও চরিত্রসম্পন্ন লোক তৈরি হয়েছে, ইসলামের প্রাসাদে যে আগুন ধরেছে তা নির্বাপিত হবে না, মুসলমানদের মধ্যে যারা সকল দিক থেকে চক্ষু বন্ধ করে আত্মকেন্দ্রিক হয়ে ইসলামী আমল আখলাকের প্রদর্শনী করেন, এ আগুন জ্বলতে থাকলে তাঁরাও নিজেদেরকে ও বংশধরকে এ আগুন থেকে বাঁচাতে পারবেন না। আগুনই অবশেষে জাহান্নামের আগুনে পরিণত হবে।

উপরোক্ত কর্মসূচি বাস্তবায়নে সবচেয়ে বড় বাঁধা মুসলমানদের বিশেষ করে আলেম সমাজের অনৈক্য। ব্যক্তিকেন্দ্রিক ও স্বার্থকেন্দ্রিক ছোটখাটো বিভেদ ভুলে গিয়ে ইসলামকে ও মুসলিম মিল্লাতকে বাতিলের আগ্রাসন থেকে রক্ষা করার জন্য ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। আলেম সমাজের অনৈক্যের কারণে খোদা না করুন একবার যদি বাতিল শক্তি মজবুত হয়ে চেপে বসে তাহলে মুসলমানদের নিধন যজ্ঞের পয়লা শিকার আলেম সমাজই হবে– তার দৃষ্টান্ত রাশিয়ায় কমিউনিস্ট বিপ্লবের পর দেখতে পাওয়া গেছে এবং সাম্প্রতিককালে আফগানিস্তানেও দেখা গেছে। আলেম সমাজ হচ্ছে নবীর আদর্শিক ও নৈতিক উত্তরাধিকারী।

কুরআনও ঘোষণা করেছে– আলেমদের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে একমাত্র আল্লাহকেই ভয় করা إِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمٰٓؤُا আল্লাহর ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত থেকে দুনিয়ার বুকে নবীর আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করা এবং তাকে অমলীন রাখার সংগ্রামই নবীর উত্তরাধিকারীর কাজ। এ কাজ অবহেলা করলে আল্লাহর কাছে কৈফিয়ত দেবার কিছুই থাকবে না।

এ দায়িত্ব যে শুধু আলেমদের তা নয়, প্রতিটি মুসলমানের। একজন মুসলমান সকল গোলামি ছিন্ন করে, সকলের শাসন ও প্রভুত্ব খতম করে একমাত্র আল্লাহ

তায়ালার গোলামি অবলম্বন করে তাঁরই শাসন ও প্রভুত্ব কর্তৃত্বের অধীনে নিজেকে সপর্দ করে। সে কখনো মানুষের গোলামি ও শাসন কর্তৃত্ব মেনে নিতে পারে না। আল্লাহর আইনই তার একমাত্র মেনে চলার আইন এবং নবীর নের্তৃত্বের অধীনেই সে তার গোটা জীবন পরিচালিত করবে। অতএব, একজন মুসলমাদের ঈমানের দাবীই হচ্ছে এই সে একমাত্র আল্লাহর আইনকেই সমাজের সর্বস্তরে বাস্তবায়িত ও কার্যকর করার সংগ্রাম করবে, রসূলের (স) আদর্শ অনুযায়ী তার ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবন গড়ে তুলবে, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও রাষ্ট্রের বুনিয়াদ প্রতিষ্ঠিত করবে। এসব করতে পারলেই তাকে যে আল্লাহ্ তায়ালার খলিফার মর্যাদায় ভূষিত করা হয়েছে, তা সে অক্ষুন্ন রাখতে পারবে।

এ কথা ভালো করে স্মরণ রাখা দরকার যে, আল্লাহর খলীফা বা প্রতিনিধি হিসেবে দুনিয়ার বুকে যথাযথ দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ তায়ালা মানুষকে ধন-দৌলতের অধিকারী করেছেন, জ্ঞান-বুদ্ধি-বিবেক দান করেছেন, লেখনী শক্তি, বাকশক্তি ও উদ্ভাবনী শক্তি দান করেছেন, বিভিন্ন পদমর্যাদায় ভূষিত করেছেন। এ সব বিভিন্ন নিয়ামত তাকে এ জন্য দেয়া হয়েছে যাতে করে সে এ সবকে আল্লাহর মর্জি মতো ব্যবহার করতে পারে। এ সব সম্পদ দান করে তকে পরীক্ষায় নিক্ষেপ করা হয়েছে। সে যদি তার ধন-দৌলত, জ্ঞান-বুদ্ধি, লেখনী ও উদ্ভাবনী শক্তি একমাত্র খোদার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য তাঁরই পথে ব্যয় করে তাহলে বুঝতে হবে সে প্রতিনিধিত্বের হক আদায় করতে পেরেছে। পক্ষান্তরে এ সব সম্পদ যদি ব্যয় করা হয় পার্থিব স্বার্থ ও প্রবৃত্তির পিপাসা মেটাবার জন্য তাহলে খোদার দেয়া সম্পদ সে আত্মসাৎই করবে এবং দাতার সাথে বিশ্বাসঘাতকতার অপরাধে অপরাধী হবে।

ঈমানের দাবী ত এটাই যে, আল্লাহ মানুষকে যা কিছুই দান করেছেন– সে দানের মধ্যে রয়েছে হাত, পা, চোখ, কান, মুখ ও মন-মস্তিষ্ক, সে সব কিছুই ব্যবহার করতে হবে দাতার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য। এ সব এমন কোন পথে ও এমনভাবে ব্যয় করা যাবে না যাতে দাতা অসন্তুষ্ট হন। এ সবকে আল্লাহর মর্জির বিপরীত পথে ব্যবহার করলে একদিকে তাদের উপর বড় জুলুম করা হবে এবং অপরদিকে নিজের উপরেও জুলুম করা হবে। কিয়ামতের দিন এ সব অঙ্গ-প্রতঙ্গ আল্লাহর দরবারে অভিযোগ করবে যে তাদেরকে তাদেরও মর্জির বিপরীত এবং

আল্লাহ তায়ালারও মর্জির বিপরীতে ব্যবহার করা হয়েছে। তার জন্য সে ব্যক্তিকে কঠোর শাস্তি ভোগ করতে হবে যাকে এ সব অঙ্গ-প্রতঙ্গ আল্লাহ্র প্রতিনিধি হিসেবে আমানত স্বরূপ দেয়া হয়েছিল।

এ তো গেল অঙ্গ-প্রতঙ্গের কথা। মানুষকে ধন-সম্পদ ও জ্ঞান বুদ্ধিসহ স্বাধীন ইচ্ছা ও কর্মশক্তি দেয়া হয়েছে তাকে পরীক্ষা করার জন্য যে এ গুলোকে সে কি তার প্রবৃত্তির চাহিদা অনুযায়ী ব্যবহার করবে– না আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য ব্যবহার করবে। তার যে ঈমান যা প্রকৃতপক্ষে তার এবং আল্লাহ্র মধ্যে আল্লাহ্র দাসত্ব আনুগত্যের চুক্তি তার দাবীই হচ্ছে এই যে তাকে যা কিছুই দেয়া হয়েছে তা অন্য পথে ব্যবহার করায় তার স্বাধীনতা থাকলেও তা ব্যবহার করতে হবে আল্লাহরই পথে। খলিফা বা প্রতিনিধির কাজই তাই।

মানুষকে আল্লাহ তায়ালা যমীনের উপর তাঁর খলিফা (Vice Gerent) করেই পয়দা করেছেন। খলিফার কাজই হচ্ছে তার নিয়োগকারীর মর্জি পূরণ করা, তার আইন কানুন যথাযথ পালন করা ও কার্যকর করা, নিজে আইন রচনাকারী হয়ে বসা নয়, স্বেচ্ছাচারী হওয়া নয় এবং এ ধারণা পোষণ করা নয় যে তাকে কারো কাছে জবাবদিহি করতে হবে না। সমগ্র প্রকৃতি রাজ্যে যেমন প্রাকৃতিক নিয়মে একমাত্র আল্লাহরই মর্জি পূরণ হচ্ছে, তাঁরই আইন মেনে চলা হচ্ছে– তেমনি মানুষের সমাজেও তাঁরই আইন চলবে, তবে তার প্রতিনিধিত্ব করবে মানুষ। মানুষকে শাসক ও আইন রচয়িতা বানাননো হয়নি। প্রকৃত শাসক ও আইন প্রণেতার প্রতিনিধি বানানো হয়েছে।

অতএব, মানুষের জন্মগত দায়িত্ব ও কর্তব্য হচ্ছে মানুষের সমাজে তার প্রভু স্রষ্টা আল্লাহ্ তায়ালার আইন কার্যকর করা। এ আইন অমান্য করার কারণেই মানুষের সমাজে বিপর্যয় ও ধ্বংস নেমে এসেছে। মানব জাতির ইতিহাস তার সাক্ষী।

যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখে না তারা এ সত্যটি অস্বীকার করে। কিন্তু যারা ঈমান রাখে, তাদের ঈমানের অপরিহার্য দাবীই এই যে, তারা ঐক্যবদ্ধভাবে সংগ্রামের মাধ্যমে আল্লাহ্ তায়ালার আইন কানুন সমাজ ও রাষ্ট্রের সর্বস্তরে কার্যকর

করবে, জনগণের মধ্যে তা মেনে চলার মানসিকতা ও আগ্রহ সৃষ্টি করবে। এ কাজে তাদের শক্তি ও কর্মপ্রেরণার উৎস হবে আল্লাহ্‌র কুরআন, নবী পাকের সীরাত ও সাহাবায়ে কিরামের কর্মপদ্ধতি, বিশেষ করে খিলাফতে রাশেদার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

উপরের ঐক্যবদ্ধভাবে সংগ্রামের মাধ্যমে যে কথা বলা হয়েছে তার অর্থ এই যে, ঈমানের সকল দাবী পূরণের কাজ তথা আল্লাহর যমীনে একমাত্র আল্লাহর প্রভুত্ব-কর্তৃত্ব, আইন-শাসন কায়েম করা একাকী বিচ্ছিন্নভাবে করা কিছুতেই সম্ভব নয়। এর জন্য একটি ইসলামী জামায়াতভুক্ত হতে হবে যার উদ্দেশ্য আল্লাহর পথে ঐক্যবদ্ধভাবে সংগ্রাম করা। কুরআনে যাকে 'জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ' বলা হয়েছে।

আশার বিষয় এই যে, পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই ইসলামের পুনর্জাগরণ ও পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন শুরু হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা ঈমানের দাবীদার মুসলমানদেরকে এ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ার তাওফিক দান করুন। আমিন।

সমাপ্ত